ভারতের মুক্তিসাধক

গোপাল ভৌমিক

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৫২
মূল্য—১৸০

প্রচ্ছদপট এবং ভিতরের ছবি এঁকেছেন : শ্রীশৈল চক্রবর্তী

প্রিণ্টার্স :
সত্যপ্রসন্ন দত্ত, বি, এস্, সি
পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বে

প্র

রচনা-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ	১
লোকমান্য তিলক	১১
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু	২১
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	৩০
লালা লাজপত রায়	৩৮
মহাত্মা গান্ধী	৪৭
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	৬৩
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন	৭৪
মৌলানা আবুলকালাম আজাদ	৯১
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু	৯৮
সীমান্ত গান্ধী	১০৯
রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র	১১৮

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

লোকমান্য তিলক

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
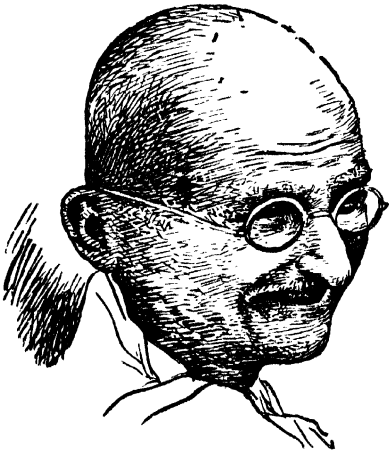
মহাত্মা গান্ধী

লালা লাজপত রায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা বলা চলে। ভারতের জনগণকে তিনিই প্রথম তাঁর ত্যাগ স্বীকার এবং অপূর্ব বাগ্মিতার গুণে রাজনীতি-সচেতন করে তোলেন। আজকের কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত। কংগ্রেসের প্রথম যুগে কিন্তু বাঙ্গালীর প্রভাব ছিল বেশী। বাঙ্গালীদের মধ্যে আবার সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নরমপন্থী দল চরমপন্থীদের হাতে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সকলের চেয়ে বেশী। শেষ বয়সে সুরেন্দ্রনাথকে বাংলা গভর্ণমেণ্টের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে দেখে বাঙ্গালীরা অবশ্য মর্মাহত হয়েছিল। তবু প্রথম জীবনে জাতীয় নবজাগরণে সুরেন্দ্রনাথের নিঃসংশয় দানকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঊনবিংশ শতকের ভারত আজকের দিনের গণজাগরণ-মুখর ভারত নয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস-খ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতের রাজনৈতিক চেতনা লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছিল। সেই স্তিমিত চেতনাকে তীব্র কশাঘাত করে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম জাগ্রত করে তুলেছিলেন। জাগ্রত গণচেতনার ভিত্তিতে আজ কংগ্রেসের পক্ষে সারা ভারতব্যাপী বিপুল প্রভাব গড়ে তোলা মোটেই কঠিন হয়নি। কংগ্রেসের বর্তমান সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকখানিই বাঙ্গালী জাতির—বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। কংগ্রেসের প্রথম যুগে দাদাভাই নৌরজী, স্যার ফিরোজ শাহ্ মেটা, বদরুদ্দিন তায়েবজী প্রভৃতি

অন্যান্য প্রদেশের শক্তিশালী অনেক নেতা ছিলেন বটে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মত ব্যাপক প্রভাব কারও ছিল কিনা সন্দেহ। তাছাড়া কংগ্রেস সংগঠনে বাংলার ত্যাগ স্বীকার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম থেকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের মোট ৩২টি অধিবেশনের মধ্যে ১২টি অধি-বেশনের সভাপতি হয়েছিলেন বাঙ্গালী। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নরমপন্থীদের কংগ্রেস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ একমাত্র ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের করাচী অধিবেশন ছাড়া, কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের জন্যে তাঁর ত্যাগ ও নিষ্ঠার অন্ত ছিলনা। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রথম যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কংগ্রেসের পর-বর্তী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মধ্যে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এক নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার। তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁর পিতা তাঁকে আই, সি, এস, পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বিলাত পাঠান। সুরেন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত একই সঙ্গে ইংল্যাণ্ড রওনা হন। বিলাতে তাঁরা তিনজনেই একযোগে আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন। বিলাতে থাকার সময়ই সুরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। দেশে ফেরার পরেই তিনি আসামের শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর উপরিওয়ালা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সুনজরে ছিলেন না। একটি মামলার বিচার নিয়ে তিনি ফ্যাসাদে পড়েন। এই

জন্যেই পরে তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হন। তাঁর এই পদচ্যুতি সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকে কিছুটা ক্ষতিকর হলেও, ভারতের পক্ষে এটা শাপে বর হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকলে আমরা তাঁর মত একজন উঁচুদরের বাগ্মী এবং দেশনেতা হারাতাম। এই চাকুরীর ব্যাপার নিয়েই সুরেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড যেতে হয়েছিল। পদচ্যুত হয়ে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়তে থাকেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিড্‌ল্ টেম্পলের কর্তৃপক্ষও তাঁর মত পদচ্যুত ভারতীয় রাজকর্মচারীকে ব্যারিষ্টারী সনদ দিতে অস্বীকৃত হন। এই প্রথম সুরেন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতীয়দের দুর্দশা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এই ঘটনা যে তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনকে যথেষ্ট রকম প্রভাবিত করেছিল সে কথা না বললেও চলে। তিনি হতাশ হয়ে কলিকাতায় ফিরে এলেন। তখন তাঁর কি দুর্দশা। প্রথমত তাঁর চাকুরী নেই—দ্বিতীয়ত সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত বলে কলিকাতার অভিজাত সমাজে তাঁর স্থান নেই। সুরেন্দ্রনাথের এই দুর্দশায় 'করুণার সাগর' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সাহায্যে অগ্রসর হন এবং তাঁকে ২০০৲ টাকা বেতনে নিজের মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। স্বদেশপ্রীতি ও জ্বালাময়ী বক্তৃতার গুণে শীঘ্রই কলিকাতার ছাত্র সমাজ সুরেন্দ্রনাথের ভক্ত হয়ে উঠল। স্বদেশের ইতিহাস এবং ইটালীর নির্ভীক নেতা ম্যাটসিনির জীবন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তৎকালীন ছাত্রসমাজে বিপুল উত্তেজনা ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। ইতিপূর্বে বিলাত থেকে ফিরে এসে আনন্দমোহন বসু "স্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন" নামে একটি ছাত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় "স্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশনের" প্রভাব

প্রতিপত্তি অসম্ভব বেড়ে যায়। এই ছাত্রসঙ্ঘ থেকেই পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-শক্তি কত অগ্রগামী ছিল তা তাঁর "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" কার্যক্রম থেকেই বোঝা যায়। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চারটি: (১) ভারতে দৃঢ়-সংবদ্ধ জনমতের সংগঠন, (২) সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, (৩) হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপন এবং (৪) সাধারণ আন্দোলনে জনগণের সংযোগ সাধন। সুরেন্দ্রনাথের "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" তরুণ ভারতের আশা ভরসা স্থল হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং পরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমনে বহির্গত হন। ভারতের সর্বত্র তাঁর তেজস্বী বক্তৃতায় জনগণ আকৃষ্ট হয়। সুরেন্দ্রনাথ শুধু বাংলাদেশের যুব-আন্দোলনেরই স্রষ্টা নন: সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনিই সর্বপ্রথম রাজনীতি-সচেতন করে তুলেছিলেন।

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী" নামক একখানি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক ও সত্বাধিকারী হয়েছিলেন। সামান্য একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে তিনি নিজের কর্মশক্তি ও লেখনীর জোরে শক্তিশালী দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইলবার্ট বিল নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ও আন্দোলেনর সঞ্চার হয়েছিল। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'তে আদালত অবমাননাকর প্রবন্ধ প্রকাশের দরুণ তুইমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাদণ্ডের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। কারামুক্তির পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর প্রচেষ্টায়

কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে বের হন বলে, এই সম্মেলনের পুনরধিবেশন বন্ধ থাকে। এই সময় মিঃ হিউম নামক একজন ভারতহিতৈষী ইংরেজ রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে ভারতবাসীদের সজাগ করে তোলেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রধানত প্রবীন। সুরেন্দ্রনাথের মত আন্দোলনকারী তরুণ নেতাকে তাঁরা সুচক্ষে দেখতেন না। তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন থেকে সুরেন্দ্রনাথ বাদ পড়েছিলেন। অবশ্য তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। তাই আমরা দেখি যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে, প্রায় ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন হচ্ছে। এর পর বৎসর কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন সুরেন্দ্রনাথের মত জনপ্রিয় শক্তিশালী নেতাকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠিত হয়। এর পর সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন তুলে দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য হয়ে দাঁড়ান। ভারতীয় জনমানসে সুরেন্দ্রনাথ যে রাজনীতি-সচেতনতার সঞ্চার করেছিলেন, তারই ফল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

জন্মের পর থেকেই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল আবেদন নিবেদনের

দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে সুবিধা আদায় করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল না। স্বায়ত্তশাসন লাভের আদর্শও কংগ্রেসের ছিল না। প্রধানত বাঙ্গালীরাই প্রথম যুগে কংগ্রেসকে অগ্রগতির পথে টেনে নিয়ে যায়। বাঙ্গালীদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী বিপ্লবী নেতা লোকমান্য তিলক। তবু বহুদিন পর্যন্ত কংগ্রেসে চরমপন্থীদল আধিপত্য লাভ করার সুযোগ পায়নি। নরমপন্থী নেতারাই ধীর মন্থর গতিতে কংগ্রেসকে টেনে নিয়ে চলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজে দুবার মাত্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণায় এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আহমেদাবাদে। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি নির্বাচনে তাঁর প্রচুর হাত ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রধান সদস্যরূপে তৃতীয়বার ইংল্যাণ্ড যান।

লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে আসার পর এমন কয়েকটি কাজ করেন যার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থী কংগ্রেস নেতারাও সরকারী নীতির উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। প্রথমত কার্জন সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যদের ক্ষমতা হ্রাস করেন, দ্বিতীয়ত জনমত-বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রবর্তন করেন এবং সর্বশেষে বঙ্গভঙ্গের আদেশ দেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত আদেশে সারা বাংলাময় প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। বাঙালীরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথও এ আন্দোলনে অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন। প্রধানত তাঁরই আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় দলে দলে ছাত্রসমাজ বয়কট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। বিপ্লবী বাংলা ও মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে কংগ্রেসের নীতিপরিবর্তনের

দাবীও আসে—এবার আবেদন নিবেদনের পালা শেষ করে সরাসরি লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে হবে। দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, তার প্রস্তাবে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও সভাপতির অভিভাষণে "স্বরাজ" কথাটি পাওয়া যায়। অবশ্য "স্বরাজের" মানে ছিল তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভ। ১৯০৭ সালে স্বরাজের এই ব্যাখ্যা নিয়ে সুরাট কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে দারুণ সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেল। চরমপন্থীরা দলে কম থাকায় লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেস ত্যাগ করে এলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নরমপন্থীরা তখন কংগ্রেসের অবিসম্বাদী কর্ণধার হলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গৌরবময় যুগ। চতুর্দিকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের এক তুমুল সাড়া পড়ে গেছিল। গান্ধীজী পরে এই জিনিসটিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এ আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি কাউন্সিলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও ত্যাগ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় এগুলোকে অন্যতম প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। এর পরে সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস-জীবন সংক্ষিপ্ত। নরমপন্থীদের হাতে কংগ্রেস টিঁকে ছিল বটে—কিন্তু জনগণের মনে আর পূর্বের মত সাড়া জাগাতে পারছিল না। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় নীতি আর জনগণের মনে লাগছিল না—তারা চাচ্ছিল সক্রিয় বিরোধ। জাগ্রত জনশক্তির সামনে নরমপন্থীরা ক্রমশই তাঁদের প্রভাব হারিয়ে ফেলছিলেন। এই সময় বাংলা দেশে ত্যাগব্রতী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব। সুরেন্দ্রনাথের আপোষকামী নরম সুর আর

ছাত্রসমাজের মনে সাড়া জাগাতে পারছিল না। তরুণের দল নতুন নেতার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভারতের জনশক্তিকে জাগ্রত করার যে গুরুভার সুরেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, তাঁর সে কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তিনি আর সমান তালে পা ফেলে চলতে পারছিলেন না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। ভূপেন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টায় প্রায় ১০ বৎসর অনুপস্থিত থাকার পর চরমপন্থী কংগ্রেস সেবীরা এই অধিবেশনে যোগ দিলেন। কিন্তু নরমপন্থী চরমপন্থীতে আর মিলন হল না। পারস্পরিক ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এখন চরমপন্থীরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দেশের জনমতের প্রতীক। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল, তাতে চরমপন্থীরাই বিজয়ী হয়ে বেড়িয়ে এলেন। কংগ্রেস তাঁদের অধিকারে চলে গেল। নরমপন্থীরা বাধ্য হয়ে কংগ্রেস থেকে বিদায় নিলেন। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথকেও কংগ্রেস ত্যাগ করতে হল। দীর্ঘদিনের সাধনা দিয়ে যে কংগ্রেসকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তার থেকে অবশেষে তাঁকে বিদায় নিতে হল। প্রথম দিকে সুরেন্দ্রনাথের কংগ্রেস-প্রীতি কিরূপ প্রবল ছিল—তার একটী মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯১১ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখের মাত্র দুইদিন পূর্বে সুরেন্দ্রনাথের পত্নী বিয়োগ হয়। এই শোক-ভারাক্রান্ত মন নিয়েও তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার কার্যে সহায়তা করেন। এ যে কত বড় নিষ্ঠার পরিচয়—তা সহজেই অনুমেয়।

কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগের পরও সুরেন্দ্রনাথ ৮ বৎসর বেঁচেছিলেন। শেষ বয়সে জনমতের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করায় বাংলায় আদৌ

তাঁর কোন জনপ্রিয়তা ছিল না। বরং যে সুরেন্দ্রনাথ একদিন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায় জনতার হাতে তাঁকে অনেক সময় লাঞ্ছনা পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিল। তাদের মনে আশা ছিল যে যুদ্ধে জয়ী হলে ব্রিটেন ভারতকে অনেকটা পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেবে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন যুদ্ধে জয়ীও হল—কিন্তু ভারতের কপালে জুটল ১৯১৯ এর মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার। ভারতের এই নতুন শাসন-সংস্কার নির্ধারণের জন্যে বিলাতে যে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি বসেছিল, সুরেন্দ্রনাথ তার অধিবেশনে যোগদানের জন্যে ইংল্যাণ্ডে গেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থী নেতারা এই শাসন-সংস্কারে সন্তুষ্ট হলেও, অগ্রগামী ভারতীয় জনমত তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বিলাত থেকে ফিরে এসে সুরেন্দ্রনাথ দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারূপে এই সময়েই মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের কথা ভাবছে। মুসলমানদের সরকার-বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলনের আরম্ভও এই সময়। বাংলা দেশের জনমত এবং যুবক সমাজের চিত্তজয় করে বসে আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তখন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতার আহ্বানে কান দেবার মত ধৈর্য কারও ছিল না। চতুর্দিকে একটা তুমুল বিক্ষোভ ও উত্তেজনার আবহাওয়া।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সুরেন্দ্রনাথ স্যার উপাধিতে বিভূষিত হন। এই সময় তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের

মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য কাজ এই যে তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে নতুন একটি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পাশ করান। লর্ড কার্জন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকার হরণ করেছিলেন—সে কথা পূর্বেই বলেছি। সুরেন্দ্রনাথের বর্তমান আইনের ফলে সে আইন নাকচ হয়ে যায়—কলিকাতা কর্পোরেশন আবার নির্বাচিত সদস্যদের শাসনাধীনে আসে। স্থির হয় যে কলিকাতা কর্পোরেশনের ৫ ভাগের ৪ ভাগ সদস্যই নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত সদস্যরাই মেয়র এবং প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত করবেন। গভর্ণমেণ্টের শুধু অনুমোদনের অধিকার থাকবে। এই নতুন আইন পাশের ফলে যে প্রথম নির্বাচন হল, তাতে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব লাভ করলেন। দেশবন্ধু হলেন কলিকাতার প্রথম কংগ্রেসী মেয়র। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যে কাউন্সিল নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ পরাজিত হলেন। এতে সহজেই বোঝা যায় যে তাঁর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি তাঁকে জনপ্রিয়তার উচ্চশিখর থেকে নীচে টেনে নামিয়েছিল। এর পরও দুবৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। এ দুবৎসরে তাঁর জীবনে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। ইতিপূর্বে ইংরেজীতে তিনি যে স্মৃতিকথা রচনা করতে সুরু করেছিলেন, সেইখানি এই সময় শেষ করেন। এই স্মৃতিকথাই পরে "A Nation in the Making" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ বইখানি শুধু সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নয়। এর মধ্যে তাঁর যুগের সমাজ ও জাতীয় জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই বইখানি সমাপ্ত করার পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন।

লোকমান্য তিলক

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা-বোধের প্রবল আলোড়ন জেগেছিল। আজ ভারতের রাজনীতি এতদূর এগিয়ে গেছে যে সে যুগের আন্দোলনের কথা আমাদের মনেও পড়ে না। সমগ্র জগৎ সেদিন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল যে বহুকাল ইংরাজের অধীনতাপাশে শৃঙ্খলিত থেকেও ভারতের আত্মা স্বাধীনতার বাণী ভুলে যায় নি। ভারত শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান অধিকার দাবী করে যে আন্দোলন স্বুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। সেই আন্দোলনকে সার্থকতার পথে টেনে নিয়ে সেদিন যাঁরা ভারতবাসীদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা এবং আত্মমর্যাদা-বোধ জাগিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অবিসম্বাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে একদল ভারতীয়ের মনে ভীষণ ব্রিটিশ বিদ্বেষ স্থষ্টি হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার মূল্য স্বীকার করলেও তারা তখন গোঁড়া হিন্দুধর্মের চর্চায় বেশী করে মনোনিবেশ করেছিল। অহিন্দু সব কিছুর উপরই তাদের ছিল ভীষণ বিতৃষ্ণা। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তিলকও ছিলেন পূরোদস্তুর রক্ষণশীল, গোঁড়া হিন্দুধর্মের পরিপোষক; শেষ জীবনে অবশ্য তাঁর এ মনোভাব অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কঙ্কণ উপকূলের রত্নগিরিতে বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্ম হয়েছিল। তিনি চিৎপাবন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত।

তাঁর প্রথম জীবনের কার্যকলাপের মধ্যে ব্রাহ্মণ রক্তের প্রভাব ছিল অপরিসীম। মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত শাসন-কর্তা পেশোয়ারা ছিলেন এই চিৎপাবন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারে মারাঠারা যেমন বাধা দিয়েছিল, তেমন বাধা আর কেউ কোনদিন দেয়নি। দাক্ষিণাত্যে মোগল সম্রাটদের রাজ্য-বিস্তারেও মারাঠারা এমনই করে বাধা দিয়েছিল। ছোট বয়সে তিলক গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মত শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছিলেন; মারাঠা চিৎপাবন রূপে তাঁর পিছনে শৌর্য বার্য এবং রাজনীতির একটা বিরাট ঐতিহ্য ছিল। যুবক বয়সে তিনি পুণা যান এবং নিউ ইংলিশ স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এর কিছু পরে তিনি পুণাতে ইংরেজী এবং মারাঠী ভাষায়—দুখানি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক এবং মালিক হয়ে দাঁড়ান। ইংরেজী সংবাদপত্রখানির নাম “মারাঠা” এবং মারাঠী সংবাদপত্রখানির নাম “কেশরী”। দেশীয় ভাষায় “কেশরীই” বোধ হয় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র। পরে “কেশরী” দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ প্রচারিত সংবাদপত্রে পরিণত হয়েছিল। প্রথম থেকেই তিলকের আদর্শ ছিল যে ইংরেজীকে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব না হলেও স্কুল কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীকে দেশীয় ভাষার নীচে স্থান দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গভর্ণমেণ্টের কোন প্রকার সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন কতকগুলো জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিলকের যখন ২৯ বৎসর বয়স, তখন বোম্বাইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হচ্ছিল। ব্রিটিশদের কাছে আবেদন নিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়েছিল, তাই আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রাম-রত কংগ্রেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে তিলকের দান কম নয়। বোম্বাই

প্রদেশে তিলক এসময় যথেষ্ট নাম করলেও তিনি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। বক্তৃতা এবং লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের যে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা এবং ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল তা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি। পুণার সার্বজনীন সভা এবং শিক্ষা সমিতির তিনি এবং রাণাডে ছিলেন প্রধান পরিচালক।

তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। এই যে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল, সে যোগসূত্র তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। মাঝখানে একবার কংগ্রেস যখন নরমপন্থী উদারনৈতিকদের হাতে চলে যায়, তখন তিনি বছর দশেকের জন্যে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যে বক্তৃতা দিতেন তার মধ্যে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি এবং নির্ভীকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেত। স্বদেশের মুক্তির জন্যে তিনি যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। অনেকটা তাঁর বক্তৃতার জন্যেই কংগ্রেস ধীরে ধীরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তিলকের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি "স্বাধীনতা আমার জন্মস্বত্ব এবং আমি তা পাবই" ভারতবাসীদের পরাধীন মনে জ্বলন্ত আশার বাণী এনে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিলকের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়। "কেশরীর" গ্রাহক সংখ্যা এই সময় ২০ হাজার ছিল। তাঁর নির্ভীক লেখনী মহারাষ্ট্রের জনগণকে স্বাধীনতা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছিল। তাঁর ভক্তের সংখ্যাও বেড়ে গেছিল অনেক-গুণ। তিলক এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়ঃ লোকের মনে বিশ্বাস এবং ভক্তি জাগানোর ক্ষমতা উভয়ের মধ্যেই অপরিসীম। বিস্ময়াপ্লুত মহারাষ্ট্রের জনগণ তিলকের নাম দিয়েছিল, "লোকমান্য"।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর তিলক মহারাষ্ট্র জনগণের মনে আত্মসম্মানবোধ এবং অতীত গৌরববোধ জাগানোর কাজে নিয়োগ করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে এবং সহরে সহরে গিয়ে সিদ্ধিদাতা গণপতির উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করেন। তাঁরই উদ্যোগে পুণায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সাধারণ গণপতি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেক গণপতি সমিতিরও প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তিনি 'কেশরীর' মারফৎ মারাঠা যুবসম্প্রদায়কে দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। মারাঠা জাতিকে আরও বেশী সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর শিবাজীর স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর রাজধানী রায়গড়ে তাঁর প্রথম স্মৃতিপূজা হয় এবং তিলক নিজে সে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। সেই উপলক্ষে তিনি যে উদ্দীপনাময় অভিভাষণ দিয়েছিলেন, ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিরাট দুর্ভিক্ষ হয়। তার প্রভাব শুধু মহারাষ্ট্রে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষত্রাণ কার্যে তিলক মনে প্রাণে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সরকারী এবং বেসরকারী চেষ্টার ফলেও লোকের দুঃখ দুর্দশা দূর করা সম্ভব হয় না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে পারছিল না বলে জনগণের মনে একটা দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এর উপর আবার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্লেগ দেখা দেওয়ায় সে বিক্ষোভ বহুগুণে বেড়ে গেছিল। প্লেগ নিবারণেও তিলক তাঁর অপরিসীম কর্মক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। পুণায় ভীষণভাবে প্লেগ সুরু হওয়ায় যে যেখানে পারছিল পালিয়ে যাচ্ছিল। তিলক কিন্তু পুণা

ছেড়ে যেতে সম্মত হন নি। তিনি সহরে থেকে নিজের শ্রমশক্তি এবং অর্থ নিয়োগ করে রোগ নিবারণের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। আর এদিকে তিনি 'কেশরীর' মারফৎ গভর্ণমেণ্টের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে সজোরে লেখনী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তা, কর্মশক্তিহীনতা এবং অযোগ্যতা তিলকের সুতীব্র সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায় নি। এমনই ভাবে তিলক গভর্ণমেণ্টের অপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পুণাতে দামোদর চাপেকর নামক একজন যুবক র‍্যাণ্ড্ এবং আয়ার্ষ্ট নামে দুজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন। এই হত্যার সঙ্গে তিলকের কোন প্রকার সংযোগ না থাকলেও তাঁর 'কেশরীর' উদ্দীপনাময় সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্যে তাঁকে এ মামলায় জড়ানো হয়। রাজদ্রোহমূলক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার অভিযোগে ৬ জন ইউরোপীয় এবং তিনজন ভারতীয় জুরির সম্মুখে তাঁর বিচার হয়। অধিকাংশের ভোটে তিলক দোষী সাব্যস্ত হন এবং বিচারে তাঁর ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কারাদণ্ডের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশী বেড়ে যায় যে কারাগার থেকে বেরুনোর পরই তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের নেতা হয়ে দাঁড়ান। এই নেতার আসন গ্রহণের জন্যে তিলকের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ ছিলনা; সে যুগে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতাস্পৃহা জাগানোর জন্যে তিনি যে আত্মত্যাগ ও প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন—আর কোন জননেতাই তা করেন নি। তিলক ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। এইটাই তিলকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দল ছিল; দাদাভাই নৌরজী,

গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন নরমপন্থী দলে—আর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্থী দলে। এই উভয় দলেরই মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা—ভারতীয়দের দ্বারা ভারত শাসন। কিন্তু মতভেদ ছিল পথ নিয়ে। নরমপন্থীরা শান্তিপূর্ণ পথে আবেদন নিবেদনের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী ছিলেন—আর চরমপন্থীরা বিশ্বাস করতেন যে আবেদন নিবেদন করে, প্রস্তাব পাশ করে কোন ফল হবে না—স্বাধীনতা লাভের জন্যে আত্মত্যাগ করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। এই সময় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশেও প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন চল্‌ছিল। তিলক মহারাষ্ট্রের নেতা হলেও বাংলায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। তিলক দেশবাসীদের নির্দেশ দিলেন যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে বিলাতী জিনিস বর্জন করতে হবে। পরে স্বাধীনতা-যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীও একাধিকবার এই বিদেশী দ্রব্যবর্জন অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে বিদেশী দ্রব্য-বর্জন নীতি আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী নরমপন্থী হলেও ঘোষণা করলেন: "আমরা কোন অনুগ্রহ চাই না, আমরা শুধু ন্যায় বিচার চাই।······সমস্ত ব্যাপারটি একটি কথায় বলা চলে—'স্বায়ত্তশাসন' অথবা 'স্বরাজ'।" তিলক বহু পূর্বেই এ দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন। নরমপন্থীদের এই সুর বদলে অনেকের মনেই আশা হল যে পরবর্তী অধিবেশনে হয়ত বিদেশী দ্রব্যবর্জন নীতি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হবে এবং ভারতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। কার্যত কিন্তু তা হল না। ১৯০৭ এর সুরাট অধিবেশনে দেখা গেল যে নরমপন্থীরা শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা পাবার নীতি ত্যাগ করেন নি। কংগ্রেস

অধিবেশনে দারুণ হট্টগোলের সৃষ্টি হল—নরমপন্থী নেতারা পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন। দ্বিতীয় দিনে দারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে সভা ভেঙ্গে গেল। এর পর সুদীর্ঘ দশ বৎসর তিলক এবং তাঁর মতাবলম্বী সহকর্মীরা আর কংগ্রেসে যোগ দেন নি।

কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তিলকের জনপ্রিয়তা আদৌ কমল না। বরং বেড়ে চলল। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলাও হয়েছিল—কিন্তু তাতেও তাঁর জনপ্রিয়তা কমে নি। 'তাই' মহারাজের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে জাল জুয়াচুরি প্রভৃতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। নিম্ন আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেও আপীলে বেকসুর মুক্তি পান। 'তাই' মহারাজের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি দেওয়ানী মামলাও আনা হয়েছিল। লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করে তিনি এ তিনটি অভিযোগ থেকেও মুক্তি পান। ইত্যবসরে তাঁর রাজনৈতিক কাজ কিন্তু একটুও থামে নি। তিনি বোম্বাইয়ের কুলিদের মধ্যে আন্দোলনের বীজ ছড়াচ্ছিলেন। তিনি কুলি মজুরদের মধ্যে গিয়ে তাদের মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে বলছিলেন এবং স্বাধীনতা-যুদ্ধে তাদের প্রবুদ্ধ করে তুলছিলেন। কুলি মজুররা তিলককেই তাদের একমাত্র নেতা বলে মেনে নিয়েছিল।

এদিকে তাঁর 'কেশরীর' জয়যাত্রা পূর্ণোদ্যমে চলছিল। 'কেশরী'র আদর্শে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেশীয় ভাষায় আরও অনেক সংবাদ-পত্রের জন্ম হয়েছিল। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে 'কেশরী'তে প্রবন্ধ লেখার জন্যেই তিলকের দ্বিতীয়বার কারাদণ্ড হয়। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে একজন সন্ত্রাসবাদীর নিক্ষিপ্ত বোমায় মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডির মৃত্যু হয়। এই উপলক্ষে তিলক সাত বৎসর আগের দামোদর চাপেকরের কাজের সঙ্গে তুলনা করে এ সম্বন্ধে 'কেশরী'তে একটি নিবন্ধ লেখেন। এবারও রাজদ্রোহ-

মূলক নিবন্ধ লেখার জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। তিলক আত্মপক্ষ সমর্থন করে ২১½ ঘণ্টা ধরে একটি বক্তৃতা দেন। বিচারে তাঁর ছয় বৎসরের জন্যে নির্বাসন দণ্ড হয়। পরে এই দণ্ড বদলিয়ে মান্দালয়ে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে পরিণত করা হয়। তিলকের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে তাঁর দণ্ডাদেশ ঘোষিত হবার পর বোম্বাইতে দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু হয় এবং ছয়দিন অবধি তার জের চলে।

তিলকের দ্বিতীয়বার কারাদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশের অবসান হ'ল বলা চলে। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছিল। তিনি প্রথমে মহারাষ্ট্রে, পরে বাংলাদেশে এবং কিছু পরিমাণে সর্বভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করেছিলেন। এই জন্যে তাঁকে "ভারতীয় আন্দোলনের জনক" বলা হয়। তিনি মহারাষ্ট্রের নেতা থেকে সর্বভারতীয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে আর প্রথম যুগের হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। কারামুক্তির পর তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর পরিণত বয়েস। এই পরিণত বয়সেও তিনি পুনরায় যৌবনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শ্রীমতী আনি বেসান্তের সঙ্গে মিলে তিনি ১৯১৫ খৃস্টাব্দে হোমরুল লীগের প্রতিষ্টা করলেন। প্রায় ১০ বৎসর পর ১৯১৬ খৃস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি পুনরায় যোগ দিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হল যে অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের মত ভারতেরও শান্তি সম্মেলনে যোগ দেবার সমান অধিকার থাকবে। এই সম্ভাবনায় শান্তি সম্মেলনে তিনি, মহাত্মা গান্ধী এবং সৈয়দ হাসান ইমাম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে নূতন ভারত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কংগ্রেসের

অভিমত জানানোর জন্যে তিলক কংগ্রেস প্রতিনিধি মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান সদস্যরূপে ইংল্যাণ্ড গেছিলেন। তিলক পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের মতবাদ যাতে সহজে প্রচারিত হয় তদুদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি পুনর্গঠন করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল—রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক আবির্ভাবে অন্য সকল নেতার জ্যোতি অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছিল। তিলকের জনপ্রিয়তা তবু অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে মুস্‌লিম লীগের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদন করতে সাহায্য করে তিনি প্রমাণ করলেন যে মুসলমানদের তিনি আর বিদেশী বলে ঘৃণা করেন না। ১৯১৯ এর অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীজী এবং তিলক দুজনেই উপস্থিত ছিলেন; দেখা গেল যে কংগ্রেসের সব সদস্যই এখন একমাত্র গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থাবান। ১৯২০ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হ'ল; গান্ধীজীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ নীতি কার্যে পরিণত করার দিন ধার্য হয়েছিল ১লা আগষ্ট। সেই দিন গান্ধীজী বোম্বাইতে এসে পৌঁছুলেন—আর সেই দিনই বোম্বাই সহরে তিলকের মৃত্যু হ'ল। তিলকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে যে বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন।

তিলকের জীবনের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব দুটি: তিনি প্রথমত ভারতবাসীদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগিয়েছিলেন। পর জীবনে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটা সর্বভারতীয় জনমত গঠন করেছিলেন। তিলকের আর একটি বড় কৃতিত্ব এই যে প্রথম

জীবনে তিনি রীতিমত ইস্‌লাম-বিদ্বেষী থাকলেও, শেষজীবনে তিনিই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী সংস্থাপনে সহায়ক হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মহাত্মা গান্ধীও আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং তিলকের চরিত্রের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে: তাঁরা দুজনেই বড় নেতা। জনগণ তিলককেও যেমন নিঃসঙ্কোচে এবং স্বেচ্ছায় নেতা বলে মেনে নিত—আজ গান্ধীজীকেও তারা তেমনিভাবে মেনে নেয়। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তিলকের কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পিতা স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম স্বরাজ্য দলের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। (১৯২০ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত মতিলাল ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা।) এই এগারো বৎসর কাল ভারতের রাজনীতির উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে—একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে পণ্ডিত মতিলাল তরুণ বয়সে রাজনীতিতে নামেন নি—নেমেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিকরূপে তিনি যখন মনে প্রাণে যোগ দেন, তখন তাঁর বয়েস প্রায় ষাট স্বদেশ-প্রেমের কি প্রবল আবেগ হৃদয়ে এলে, এই বয়েসে

দেশের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করা যায়—তা সহজেই অনুমান করা চলে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর জন্ম হয়েছিল। ঠিক এই দিনটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও জন্ম নিয়েছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষরা কার্য গতিকে কাশ্মীর ত্যাগ করে এসে যুক্তপ্রদেশে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বংশের চেহারায় এখনও কাশ্মীরী রক্তের ছাপ সুস্পষ্ট। মতিলালের গায়ের রঙ ছিল ধবধবে ফর্সা—মুখে ছিল বীরত্বব্যঞ্জক নির্ভীকতার চিহ্ন। ছোটবেলায় পড়াশুনোয় মতিলালের খুব বেশী আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। তবে তিনি যখন সাধারণ পড়াশুনো শেষ করে আইন পড়তে সুরু করেন, তখন আইনে তাঁর খুব বেশী আগ্রহ দেখা যায়। হাইকোর্টের ওকালতি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। তাঁর ব্যবসায়ী জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছিল। তাঁর জন্মের তিন মাস পূর্বেই তাঁর পিতা দেহত্যাগ করেছিলেন। বড় ভাই নন্দলাল তাঁর পিতার স্থান দখল করেছিলেন বলা চলে। তিনি ছোট ভাইকে সযত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁকে নিজের আইন-ব্যবসায়ে বসিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মতিলাল ব্যবসায় সুরু করার কিছুদিন পরেই নন্দলালের মৃত্যু হয়। ফলে তরুণ বয়সেই তাঁর উপর সমস্ত পরিবারের ভার এসে পড়ল। তাঁর পরিবারের সবাই থাকতেন এলাহাবাদের আনন্দ ভবনে—যে আনন্দ ভবন পরে কংগ্রেসের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে এবং নিজের উচ্চাশার ফলে মতিলালকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হ'ত। তিনি নিজেও পরিশ্রম করতে

ভালবাসতেন। অতি শীঘ্রই তিনি আইন-ব্যবসায়ে সম্মান ও সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর প্রথম বয়সের সন্তান। বহুদিন পরে তাঁর দুটি কন্যা হয়। তাঁদের অন্যতমা হচ্ছেন সুপ্রসিদ্ধা দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

মতিলাল প্রথম থেকেই অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। এই অতিথি-পরায়ণতার জন্যে তাঁকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হ'ত। তিনি একাধিকবার ইউরোপে গিয়েছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণের ফলে তিনি পাশ্চাত্যের আদর্শে খুব ব্যয়বহুল জীবন যাপন করতেন। তাই তাঁর অস্বাভাবিক ব্যয়ের সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্য ধরণের জীবন যাপন সম্বন্ধে উত্তর ভারতে অনেক অসম্ভব ও অবাস্তব গল্প জন-সমাজে প্রচারিত ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে এই জাতীয় মিথ্যা গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মতিলালের জীবনে পরে দেখা গেছে যে বাইরে তাঁর চরিত্রে যতই সাহেবিয়ানা থাক, অন্তরে মানুষটি ছিলেন খাঁটি—স্বদেশপ্রেমিক। যখন দেশের ডাক এসেছিল, তিনি এক মুহূর্তেই সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুলে শিক্ষিত ইংরেজ যুবকদের খুব প্রশংসা করতেন। তাই তিনি নিজের একমাত্র ছেলে জওহরলালকে হ্যারোর পাবলিক স্কুলে শিক্ষা লাভের জন্যে অতি অল্প বয়সেই বিলাতে পাঠিয়েছিলেন।

মতিলালের জীবনে প্রথম বড় পরিবর্তন আসে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসর পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিরীহ দেশবাসীদের প্রতি যে অন্যায় অবিচার করেন তাঁর প্রতিবাদে সমগ্র ভারত মুখর হয়ে ওঠে। ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেস আলোচ্য ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্যে একটি কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। সামরিক আইন জারী করে পাঞ্জাবে গভর্ণমেণ্ট যে সব

লজ্জাজনক কাজ করেছিলেন, তাই ছিল অনুসন্ধানের বিষয়। সামরিক আইন প্রত্যাহার করার পরে পাঞ্জাবে প্রবেশ সম্ভব হওয়া মাত্রই তাঁর পুত্র জওহরলাল একা পাঞ্জাবে এসেছিলেন। এর পরেই এলেন মতিলাল নেহেরু। তারপর গান্ধীজীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর তিনিও এলেন। মতিলাল এবং গান্ধীজী উভয়েই সুনিপুণ আইনজ্ঞ; তাঁরা যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে সমস্ত তথ্য বিচার করতেন। অমৃতসর, লাহোর এবং বিশেষ করে গুজরাণওয়ালা জেলায় পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী শুনে মতিলাল শিউরে উঠতেন। পাঞ্জাবের ঘটনাই তাঁকে পুরোদস্তর গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী করে তুলল। ইতিপূর্বে তাঁর জীবনধারণে ছিল কেতাদুরস্ত সাহেবিয়ানা; ভারতেএবং ইংল্যাণ্ডে তাঁর অনেক ইংরেজ বন্ধু ছিল। ভারতের অভিজাত মহলেও তাঁর বন্ধুর অভাব ছিল না। যদিও তিনি ইতিপূর্বে কিছুদিন কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন, তবু তাঁর মতবাদ ছিল নিয়মতান্ত্রিক উদারপন্থী। কিন্তু অমৃতসর তাঁর জীবনের মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেল। যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি এতদিন পর্যন্ত জীবন গড়ে তুলেছিলেন, তা যেন গেল ভেঙে। সেই বৎসরই অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে পুরাতন উদারনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে এবার বিচ্ছেদ আসন্ন। এর পরে যখন মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান এল, মতিলাল তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তিনি সব কিছু লাঞ্ছনা নির্যাতনের কথা ভাল ভাবে ভেবে চিন্তেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করলেন। তাঁর এই নতুন সিদ্ধান্তে মতিলাল সমগ্র পরিবারের সমর্থন পেলেন। এলাহাবাদের নেহেরু পরিবারের বৈশিষ্ট এখানেই। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সমগ্র

পরিবারের স্বার্থত্যাগের তুলনা হয় না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং জওহরলালের সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহেরু এবং স্ত্রী কমলা নেহেরুও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবু আন্দোলনের প্রথম থেকেই কিন্তু মতিলাল ও জওহরলালের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। জওহরলাল ছিলেন চরমপন্থী আর মতিলাল ছিলেন নরমপন্থী। গান্ধীজীর অসহযোগ কর্মসূচীর মধ্যে সরকারী চাকুরী ত্যাগ, আইনসভা বর্জন, স্কুল কলেজ ত্যাগ প্রভৃতি ছিল। অসহযোগের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পরই মতিলাল বুঝলেন যে তিনি যদি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ঢুকে ভিতর থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আঘাত হানেন, তবে তাতে কাজ হবে বেশী। তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ নেতা এবং পণ্ডিত মতিলালের অন্তরংগ বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও ছিল এই অভিমত। তাঁরা দুজনে মিলে তাঁদের এই নতুন সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হলেন। কাজেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের মৌলিক মতবিরোধ দেখা দিল। ফলে মতিলাল এবং চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল নামে কংগ্রেসের সমান্তরাল একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। পরে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস স্বরাজ্যদলের নীতি অনুমোদন করে। কাউন্সিল প্রবেশ-নীতি অনুমোদনের পরে যে নির্বাচন হয়, তাতে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজ্যদলের নেতা হন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বয়ং। এইবার তিনি আইনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পুরোপুরি সরকারের বিরুদ্ধে নিয়োগ করার অপূর্ব সুযোগ পেলেন। তিনি সম্মিলিত বিরোধী দলেরও নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিজেদের অস্ত্র প্রয়োগ করেই তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ঘায়েল করতে পারবেন। কার্যক্ষেত্রে

তিনি করেছিলেনও তাই। তাঁর অপরিসীম উদ্যম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিরোধী দলের হাতে বহুবার ভোটে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু এইসব পরাজয়ে শেষ পর্যন্ত ফল হতনা কিছুই। কোন বিল ব্যবস্থা পরিষদে পরাজিত হলেও, বড়লাট তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে তাকে আইনে পরিণত করতেন। তা ছাড়া ধীরে ধীরে ভিতর থেকেও স্বরাজ্যদলে ঘুণ ধর্‌ছিল। সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সদস্যদের দলে টানার জন্যে নানারকম চেষ্টা চল্‌ছিল; কাউকে কোন বিশেষ কমিটিতে নেওয়ার লোভ দেখানো হত, কাউকে দেখানো হত চাকরীর লোভ। ফলে কারও কারও আদর্শ-চ্যুতি ঘট্‌ত। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে মতিলাল যে স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি করেছিলেন, তার এই পরিণতিতে তিনি অন্তরে ব্যথা পেতেন।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে গান্ধীজীর সঙ্গে মতিলালের মতান্তর হলেও মনান্তর হয়নি কখনও। তাঁর পরিবারের সঙ্গে গান্ধীজীর হৃদ্যতার সম্পর্ক পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই ছিল। নিজের দিক থেকে মতিলাল যেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং নির্ভীক ছিলেন, গান্ধীজীও ছিলেন তেমনই। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মতিলাল গান্ধীজীকে তাঁর মতবাদ বোঝানোর জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু পারেন নি। উভয়ের কেউ কাউকে স্বমতে আনতে পারেন নি—অথচ উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধার অন্ত ছিলনা। আত্মজীবনীতে পণ্ডিত জওহরলাল পিতার চরিত্রের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন: "তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা এবং কিছু পরিমাণে রাজকীয় ভাব ছিল। যে কোন সম্মেলনে তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তবে তাঁকে কেন্দ্র করেই সব জল্পনা কল্পনা চলত।" সত্যই মতিলালের চরিত্রে মানুষকে আকৃষ্ট

করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। আরেকস্থানে জওহরলাল লিখেছেন: "আমার মনে পড়ে আমি গান্ধীজীকে বাবার গোঁফহীন একখানা প্রতিকৃতি দেখিয়েছিলাম। এর আগে পর্যন্ত তিনি বাবার মুখে সুন্দর এক জোড়া গোঁফ দেখে এসেছেন। তিনি এই ফোটো দেখে প্রায় চমকে উঠলেন এবং বহুক্ষণ ধরে ফোটোটির দিকে চেয়ে রইলেন। কেননা গোঁফের অনুপস্থিতিতে মুখ এবং চিবুকের কাঠিন্য বেরিয়ে পড়েছিল; এবং তিনি কিছুটা শুকনো হাসি হেসে বললেন যে কিসের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হয়েছে, এখন তিনি তা বুঝতে পারছেন। চোখ এবং মাঝে মাঝে হাসি-জনিত রেখার দরুণ মুখটা অবশ্য নরম দেখাত। কিন্তু সময় সময় চোখ দুটো চকচক করে জ্বলত।" ভিতরে যতই দৃঢ়চরিত্র হন, মতিলালের মধ্যে হাস্যরসের অভাব ছিল না। কথার মারপ্যাঁচে তাঁর জুড়ি ছিল না। গান্ধীজীকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনই তাঁকে নিয়ে তাঁর রসিকতারও অন্ত ছিল না। কিন্তু মতিলালের চেয়ে কেউ বোধ হয় গান্ধীজীকে বেশী শ্রদ্ধা করত না। একবার তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "অনড় বিশ্বাস এবং অজেয় শক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর সোজা দাঁড়িয়ে ঐ একান্ত একাকী বিনয়ী ব্যক্তিটি তাঁর স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমির জন্যে আত্মত্যাগ এবং যন্ত্রণা সইবার বাণী পাঠিয়ে চলেছেন।" মহাত্মা গান্ধীর প্রতি মতিলালের এই শ্রদ্ধা জওহরলালও পেয়েছেন। শুধু তাই নয়---সমগ্র নেহেরু পরিবারই গান্ধীজীর পরম ভক্ত।

স্বরাজ্য দলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে মতিলাল যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের জন্যে একটি শাসন-তন্ত্র রচনায়ও মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁকে এ কাজে সাহায্য করবার কেউ ছিলনা বললেই হয়। তাঁর শাসন-তন্ত্র রচনার মূল ভিত্তি ছিল যে

ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাবে। এই নিয়ে পিতা পুত্রের মধ্যে মত-বিরোধ সৃষ্টি হয়। জওহরলালের মত ছিল যে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বরাজ পাবে—ব্রিটিশ কমন্-ওয়েলথের সঙ্গে তার কোন বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক থাকবে না। অবশেষে পিতাপুত্রের মধ্যে অনেক মত-বিরোধের পরে স্থির হয় যে ১৯২৯ সালের মধ্যে ব্রিটেন যদি ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়, তবেই ভারত তা গ্রহণ করবে—তার পরে নয়। ১৯২৯ এর পরেও ব্রিটেন যখন ভারতের এ দাবী পূরণ করল না, তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পুনরায় অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হল।

এর পরে মতিলালের রাজনৈতিক জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁর পরিবারের আরও অনেকের সঙ্গে তিনি গান্ধীজী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। এর বহুপূর্ব থেকেই তিনি দুরারোগ্য হাঁপানী রোগে ভুগ্ছিলেন। হাঁপানীতে তিনি প্রচুর শারীরিক কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং তাঁর হৃদ-রোগও দেখা দিয়েছিল। এই সময় তাঁর বয়েসও হয়েছিল ৭০ বৎসর। কিন্তু সবাই যখন দেশের জন্যে হাসিমুখে কারাবরণ কর্ছিল, তখন মতিলালের মত দৃঢ়-চরিত্র লোকের পক্ষে চুপচাপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। কাজেই তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করলেন।

কারাগারে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হল। কারাগৃহে যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাঁর হাঁপানী এবং হৃদরোগ বেড়ে গেল। তবু কেউ যদি তাঁকে বলত যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ তাঁর মুক্তি পাওয়া উচিত, তবে তিনি রেগে যেতেন। এমন কি তিনি বড়লাট লর্ড আরউইনের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কোন বিশেষ দয়া চান না। কিন্তু ডাক্তারের

উপদেশে ঠিক আড়াই মাস কারাবাসের পর তিনি মুক্তি পেলেন। এর পরেই তাঁর একমাত্র পুত্র জওহরলাল পঞ্চমবারের জন্যে কারারুদ্ধ হলেন। বৃদ্ধ মতিলাল নিজেকে সংযত করে উপস্থিত সকলের কাছে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে তাঁর অসুখ আর থাকবে না। কিছুদিন তাঁর অদম্য মনের জোরের কাছে দৈহিক অসুস্থতা হার মানল; কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর থুথুতে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে রক্ত দেখা দিল। কাজেই সমুদ্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হল; কিন্তু এত দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হল যে কলকাতা থেকেই তাঁকে এলাহাবাদে ফিরে আসতে হল; তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্যে তাঁর প্রিয় পুত্র জওহরলালকে কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই মুক্তি দেওয়া হল। যারবেদা জেল থেকে মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য অনেক কংগ্রেস নেতাও মুক্তি পেয়েছিলেন। এঁরা সবাই এলাহাবাদে এলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে এক একজন করে সবাই তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীকে মতিলাল বলেছিলেন: "আমি শীঘ্রই চলে যাচ্ছি: কাজেই পৃথিবীতে থেকে স্বরাজ দেখা আমার হবে না। কিন্তু আমি জানি আপনি স্বরাজ এনেছেন।" ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী সব শেষ হয়ে গেল। সমগ্র ভারতে পড়ল একটা বিষাদের ছায়া। ভারতের অগণিত নরনারীর কাছে মনে হল যে তাঁরা একজন প্রিয়তম নিকট আত্মীয়কে হারালেন। বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর শবদাহ করা হ'ল। গান্ধীজী সমস্তক্ষণ সঙ্গে ছিলেন। চিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী হৃদয়-বিদারক কয়েকটি কথা বললেন। তারপর সবাই নিঃশব্দে বাড়ী ফিরে গেল। পিতার মৃত্যুতে জওহরলাল যে শোক পেলেন তা অবর্ণনীয়। সমগ্র ভারত থেকে জওহরলাল

সান্ত্বনা-জ্ঞাপক অজস্র চিঠি পেলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যাঁরা তাঁর মতিলালের বিরোধী দলে ছিলেন, তাঁরাও চিঠি লিখলেন। বড়লাট লর্ড আরউইন এবং তাঁর পত্নী লেডী আরউইনও শোক-জ্ঞাপক বাণী পাঠালেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "এই সদিচ্ছা ও সহানুভূতির অজস্রতা আমাদের শোকের তীব্রতা কিছুটা কমিয়েছিল ; কিন্তু সর্বোপরি গান্ধীজীর আশ্চর্যজনক শান্তিদায়ক এবং আরামদায়ক উপস্থিতিই আমার মাকে এবং আমাদের সবাইকে জীবনের এই সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে সাহায্য করেছিল।"

স্বাধীনতার সৈনিক মতিলালের চরিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে তাঁর সহজাত শালীনতা এবং সৌজন্যবোধ হারিয়ে ফেলেন নি। জীবনের সর্ববিভাগেই তাঁর চরিত্রের রাজকীয় মহত্ব লোকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করত। অনেকটা নিজের চরিত্রগুণেই তিনি ব্যবস্থা পরিষদের বিতর্ককে এতটা উচ্চ স্তরে টেনে উঠিয়েছিলেন যে তাঁর বিরোধীদলের সদস্যরাও তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাই তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল "ব্যবস্থাপরিষদের অভিজাত সদস্য" (Aristocrat of the Assembly)। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে সেটা বহুলাংশে পরিপূরণ করেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র তরুণ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যই বোধ হয় বর্তমানে ভারতের প্রবীণতম রাষ্ট্রনীতিবিদ্। তিনি গান্ধীজীর চেয়ে প্রায় ৭ বৎসরের বড়। তাঁর বর্তমান বয়েস ৮৩ বৎসর। মহাত্মাজীর সঙ্গে মালব্যজীর যেমন অনেক বিষয়ে চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে, তেমনই তাঁদের চরিত্রগত বৈষম্যও খুব কম নয়। প্রথমে সাদৃশ্যের কথাই ধরা যাক। গান্ধীজী রাজনীতিবিদ্ হলেও তাঁর চরিত্রে ধর্ম এবং অধ্যাত্ম-বোধের সুন্দর বিকাশ দেখা যায়। এই ধর্মবোধ মালব্যজীর চরিত্রেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের ধর্ম-বোধের মধ্যেও বিপুল পার্থক্য। ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজী ধর্ম-বোধকে যত উঁচুতেই স্থান দিন, দেশ-প্রীতি এবং বৃহত্তর জাতীয়তা-বোধের কাছে তাঁর ধর্ম-বোধ ম্লান হয়ে যায়। মালব্যজীর চরিত্র কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম-বোধ তাঁর চরিত্রে এমন ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত যে দেশ-প্রীতি এবং ধর্ম-বোধের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে, শেষ পর্যন্ত ধর্ম-বোধই বিজয়ী হয়। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম বিশ্বমানবতার ধর্ম—আর মালব্যজীর ধর্ম গোঁড়া হিন্দু ধর্ম। এ যুগের আর কোন জাতীয় নেতার চরিত্রেই এরূপ গোঁড়া শাস্ত্রীয় ধর্ম-বোধের বিকাশ দেখা যায় নি। হিন্দুধর্মের সমস্ত বাধা নিষেধকে তিনি যথা সম্ভব সযত্নে মেনে চলেন। হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার নিয়ম সযত্নে মেনে চলতে গিয়ে তাঁকে জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টও পেতে হয়েছে। তাঁর এই গোঁড়া ব্রাহ্মণসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই তিনি ভারতের অন্যান্য জাতীয় নেতাদের চেয়ে ভিন্ন। অথচ মালব্যজী যে বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দুধর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি

ব্যাপারে তিনি পুরোদস্তুর রক্ষণশীল হলেও, জাতীয় ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী কিন্তু অনেক উন্নত—অনেক উদার। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি তাঁর জীবনে প্রথম থেকে কাজ করে আস্‌ছে। এ দুটির পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণে পড়ে তিনি নাস্তানাবুদও কম হন নি। এই বিরোধে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে তাঁর হিন্দুধর্মগত গোঁড়ামী। যত তাঁর বয়েস বেড়ে গেছে ততই তাঁর চরিত্র থেকে জাতীয়তা-বোধ যেন কমে এসেছে—জাতীয়তা-বোধের স্থান দখল করেছে হিন্দুধর্ম-প্রীতি।

তাঁর চরিত্রে শাস্ত্রীয় নিষ্ঠা-বোধ থাকলেও কুসংস্কারের স্থান নেই। কোন একটি কাজ যদি তিনি শাস্ত্র-সঙ্গত বলে মনে করেন, তবে জনমতের বিরুদ্ধে গিয়েও সে কাজ করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের একটা কলঙ্ক স্বরূপ। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও অস্পৃশ্যতার সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই মহাত্মাজী যে অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন, তার পিছনে মালব্যজীর পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। তিনি শাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করেছেন যে হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও অস্পৃশ্যতা সমর্থিত হয় নি এবং প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে এর কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। বরং প্রাচীন কালের হিন্দু শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় যে নীচ বর্ণের অনেক লোক, নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং চরিত্রগত গুণাবলীর জোরে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের শিক্ষাদাতার কাজ করেছেন। তাই মালব্যজী অস্পৃশ্যতার মত কুপ্রথাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন এবং এর বিরোধিতা করেন। তিনি নিজে তীব্র ভাষায় এই কুপ্রথার নিন্দা করেছেন। এমন কি নিজে শুদ্ধি করে হিন্দুধর্মত্যাগী অনেক লোককে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতেও তিনি কসুর করেন নি। আবার হিন্দুসমাজের অপর একটি কুপ্রথা—শিশুবিবাহ নিবারণের জন্যে যখন ব্যবস্থা পরিষদে আইনপ্রণয়নের চেষ্টা হয়েছিল, তখন মালব্যজী তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর

মতে শিশুবিবাহের ব্যাপারে হিন্দু শাস্ত্রের পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। তাই তিনি কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন করে শিশুবিবাহ নিবারণের বিরোধী। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় শিশুবিবাহ না দেয়, সেটা ভাল কথা। তিনি নিজের পরিবারেও যুগধর্ম অনুসারে বিবাহের বয়েস বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই হ'ল মোটামুটি মালব্যজার চরিত্রের কাঠামো। এই আধুনিক পরিবর্তনশীল যন্ত্রযুগেও যিনি মধ্যযুগীয় অনেক অপ্রচলিত প্রথাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, সেই গোঁড়াব্রাহ্মণ পণ্ডিত মালব্যজীর চরিত্রের প্রকৃত মহত্ব কোথায়? মহত্ব আছে বই কি! তা নইলে তিনি ভারতের অসংখ্য হিন্দু জনসাধারণের এত প্রিয় কেন? তাঁর মহত্ব এইখানে যে তিনি এই যন্ত্রযুগেও বিগত যুগের ভারতীয় মুনি-ঋষিদের আদর্শ সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বর্তমান যুগের নিষ্ঠুর আদেশে তিনি অতীত যুগের যেটুকু বৈশিষ্ট এবং মহত্ব আছে তা ত্যাগ করতে চান না। তিনি অতি সহজ সরল জীবন যাপন করেন; তাঁর খাদ্য এবং বসনভূষণ মুণিঋষিদের মত, সত্য, ন্যায় এবং অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ অত্যন্ত উদার। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁরা পূতচরিত্র মালব্যজীকে জানেন, তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। প্রাচীন যুগে ভারতীয় ব্রাহ্মণরা যে পবিত্র উদার জীবন যাপন করতেন, বর্তমান যুগে মালব্যজী সেই পবিত্র জীবনেরই জীবন্ত আদর্শ। এই রক্ষণশীল পূত চরিত্রের গুণেই মালব্যজী ভারতীয় হিন্দুদের একটা বিরাট রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছেন।

অনেক সময় আবার দেশের দুর্দিনে যখন জাতীয়তার বৃহত্তর আহ্বান এসেছে, তখন মালব্যজী সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। সে আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁকে অনেক রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের বিধি-বহির্ভূত কাজও করতে হয়েছে। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ

দেবার সিদ্ধান্ত তিনি যখন করেন, তখন তাঁকে এমনই একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু দেশ এবং জাতির বৃহত্তর আহ্বানে তিনি কালাপানি পার হতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন মালব্যজীর রাজনৈতিক জীবনে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। তিনি চিরদিনই ভারতের কংগ্রেস ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি সামরিক আইন উঠে যাবার পর প্রথম সুযোগেই—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাঞ্জাবে গেছিলেন এবং পাঞ্জাবের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এবং স্বকর্ণে শুনে তিনি যে বিবরণ তৈরী করেছিলেন, সেই বিবরণ থেকেই ভারতবাসীরা এবং জগদ্‌বাসীরা সর্বপ্রথম পাঞ্জাবের অবস্থা জানতে পেরেছিল। অমৃতসরের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে ভুল করেছিলেন, তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও সুতীব্র ভাষায় তার নিন্দা করেছিলেন। অমৃতসরের লোকেদের উপর গভর্ণমেণ্ট জোর করে যে লজ্জা এবং অপমান চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সে যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক এবং অপরাধের সামিল, মালব্যজী সেই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অমৃতসরের ব্যাপার নিয়ে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়াস পেল, তখন কিন্তু মালব্যজী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি কংগ্রেসের আদেশে ব্যবস্থা-পরিষদ্ পরিত্যাগ করতে রাজী হতে পারলেন না। আবার এদিকে তিনি কংগ্রেস ছাড়তেও নারাজ; প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আশৈশব সুগভীর অনুরক্তি এবং আনুগত্য ছিল। কংগ্রেসের প্রতি মালব্যজীর আনুগত্যকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে তিনি যখন বারবার উঠে বক্তৃতা দিতেন এবং সকলের সঙ্গে একমত হয়ে ভোট দিতে অস্বীকার করতেন, তাঁর বক্তব্য সর্বদা শ্রুতিমধুর

না হলেও সবাই তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হ'ত, তাঁরাও কখনও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারতেন না। কিন্তু তিনি নিজেও অন্যের মত বদলাতে পারতেন না—অন্যরাও তাঁর মত বদলাতে পারত না। সবাই জানত যে তাঁর বিবেক আদেশ করলে তিনিই সর্বপ্রথম কারাবরণ করবেন ; কিন্তু এই বিবেকের আদেশ পেতে তাঁর অনেক সময় লেগেছিল। কেউ এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর একনিষ্ঠতা কিংবা সাহস সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পারত না। অবশেষে তিনি আইন অমান্য করে সকলের সঙ্গে কারাবরণই করেছিলেন। পাঞ্জাবের ব্যাপারে মহাত্মাজীর মত মালব্যজীরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গভর্ণমেণ্ট অন্যায় করেছেন এবং সে অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রতিকারের জন্যে তিনি প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত যেতে রাজী ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনের পরে পরেই মোপলা বিদ্রোহ হয়। এই মোপলা বিদ্রোহের ফলে মালাবারে অনেক হিন্দুকে জোর করে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। এই জন্যেই হিন্দুধর্মে উগ্র মতাবলম্বী মালব্যজীর পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর মত সর্বান্তকরণে খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের দিকে মালব্যজীর মনে এমনই বিরুদ্ধ শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব চল্‌ছিল। তাঁর নিজের সঠিক অবস্থা তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন না।

এর পরই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চূড়ান্ত রকমের অসহযোগ আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে ব্যবস্থা পরিষদের মধ্যে থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাতে মনস্থ করলেন। এঁদের সিদ্ধান্তে মালব্যজীই সুখী হলেন সব চেয়ে বেশী। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁর পথে ছিল অনন্ত বাধা। তাঁর অবস্থা আর কংগ্রেসের মধ্যস্থিত স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অবস্থা এক ছিল না। মতিলালের

লক্ষ্য ছিল আইন-সভার মধ্যে থেকে গভর্ণমেণ্টের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা—ভাঙন ধরানো। কিন্তু মালব্যজী সর্বান্তকরণে এ মতও সমর্থন করতে পারতেন না—তা ছাড়া তাঁর পক্ষে জাতীয়তার জন্যে হিন্দুধর্মকে দূরে সরানোও সম্ভব ছিল না। যখনই জাতীয়তা এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে বিরোধ বেধেছে, তখনই মালব্যজীর কাছে জয়ী হয়েছে হিন্দুধর্ম। তা ছাড়া মন এবং রাজনীতির দিক থেকেও তিনি উদারপন্থী—তাঁর পক্ষে চরমপন্থী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর উদারতন্ত্র ভালবাসেন—এ যুগের সাম্যবাদ তাঁর মনঃপূত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের উদার মতাবলম্বী প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনের প্রভাব মালব্যজীর উপরে খুব বেশী বলে মনে হয়। তিনি ব্যবস্থা পরিষদে যে সব বক্তৃতা দিতেন তাও অনেকটা গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতার আদর্শে রচিত। মালব্যজীর বাগ্মিতা অসাধারণ না হলেও প্রশংসনীয়। ব্যবস্থা পরিষদে তিনি যে সব বক্তৃতা দিতেন পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে তার গুরুত্ব বড় কম ছিল না। বিদেশে ভাড়াটিয়া ভারতীয় কুলি রপ্তানী এবং পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নির্ভীকতা এবং স্বদেশ প্রীতির পরিচয় যেমন পাওয়া গেছিল তেমনই এ বক্তৃতা সমগ্র দেশের মনে সাড়া এনেছিল।

ভোটে যখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্যদলের নেতারূপে নির্বাচিত হলেন, তখন সবাই আশা করেছিল যে পুরানো কংগ্রেসকর্মী হিসাবে মালব্যজীও বোধ হয় এই দলে যোগ দেবেন। কার্যত কিন্তু তা হ'ল না। মালব্যজী নিজে একটি দল গঠন করে তার নাম দিলেন জাতীয় দল। মালব্যজীর দলে শুধু হিন্দুদেরই স্থান ছিল। মালব্যজীর দলের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ ছিলেন তাঁর পুরানো বন্ধু পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়। যখন পরিষদে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বড় ধরণের কোন

নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত হ'ত, তখন উভয় দলই প্রায়ক্ষেত্রে একসঙ্গে ভোট দিত। কিন্তু অনেক ছোটখাটো ব্যাপারে—বিশেষ করে হিন্দুধর্ম ঘটিত ব্যাপারে—উভয় দলের মতভেদ দেখা যেত।

এর পরেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন সুরু হ'ল তখন মালব্যজীর মতবাদ গেল সম্পূর্ণ বদলে। এই বছর মালব্যজী তাঁর পুরানো দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব কাটিয়ে উঠলেন। তিনি এবার পুরোপুরি অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন। এর জন্যে তাঁকে বার কয়েক কারাবরণ করতেও হয়েছিল। লবণ আইন ভঙ্গের ফলে মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হন। গভর্ণমেণ্ট এই সময় অনেক নতুন অর্ডিনান্স জারী করেন। ফলে বোম্বাই সহরে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে জনতার উপর লাঠি চালায়। এই সব ব্যাপার নিয়ে গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনগণের মনে বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়। এই সময় মালব্যজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অপরাপর সদস্যের সঙ্গে একবার পথে বসে সত্যাগ্রহ করেন। পুলিশ তাঁদের পথ আটকিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আর তাঁরা অহিংস পদ্ধতিতে আইন অমান্য করে গভর্ণমেণ্টের অন্যায় জুলুমবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এর পর প্রবীণ বয়সেও মালব্যজীকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে—তবে কোন সময় বেশীদিনের জন্যে তাঁকে কারাগারে থাকতে হয় নি।

মালব্যজীর একবারের কারাবাস সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা দিয়েছেন: "পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকেও অন্য একটি জেল থেকে নৈনীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তাঁকে আমাদের ব্যারাকে না রেখে আলাদা করে রাখা হয়েছিল কিন্তু প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হত এবং হয়ত বাইরের চেয়ে এখানেই আমি

তাঁকে বেশী দেখেছিলাম। জীবনীশক্তিতে ভরপুর, সর্ববিষয়ে যুবকের মত আগ্রহশীল—তিনি আনন্দদায়ক সঙ্গী ছিলেন। এমন কি তিনি রণজিতের সাহায্য নিয়ে জার্মান শিখতেও সুরু করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিশক্তি দেখা যেত। তিনি যখন নৈনীতে ছিলেন, তখন বেতমারার সংবাদ এসেছিল এবং ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি অস্থায়ী প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে পত্র লিখেছিলেন। এর পরে পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জেলের আবহাওয়ার মধ্যে শীত সহ্য করে উঠতে পারেন নি। তাঁর অসুস্থতা ভীষণ হয়ে উঠল, তাঁকে সহরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হ'ল এবং পরে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই তাঁকে মুক্তি দিতে হয়েছিল। সুখের বিষয় তিনি হাসপাতালেই সেরে উঠেছিলেন।" এর পরেও আবার ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহেরুর সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন। এই সব ক্ষেত্রে মালব্যজীর চেয়ে বেশী সাহস এবং দৃঢ়তা নিয়ে আর কেউ কারাবরণের জন্যে এগিয়ে যেতে পারতেন না।

রাজনীতি এবং ধর্মচর্চা ছাড়াও শিক্ষা প্রচার বিষয়েও মালব্যজীর অপরিসীম আগ্রহ এবং উৎসাহের কথা সর্বজনবিদিত। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মালব্যজীর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্যে তিনি ভারতীয় ধনীদের কাছ থেকে যে অপরিসীম শ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, সে শুধু তাঁর মত দৃঢ়চরিত্র লোকের দ্বারাই সম্ভব। তাঁরই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়টি আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তবে এটি পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে ভয়ের কারণও আছে। এখান থেকে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিষ ছড়িয়ে পড়া সম্ভব। অবশ্য মালব্যজীর নিজের মনে তেমন কোন

অসদুদ্দেশ্য ছিল না—কিংবা নেইও। কিন্তু বর্তমানে ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এত ভীষণভাবে শিকড় গেড়েছে যে সাম্প্রদায়িক সব প্রচেষ্টাই জাতীয় জীবনের পক্ষে ভয়ের কারণ। যুক্ত প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অনিবার্য কারণ বশতই উভয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রচার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মালব্যজী বেঁচে থাকতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শোচনীয় পরিণতি হবে না—এ আশা আমরা করতে পারি।

মালব্যজী আজ অতিবৃদ্ধ। তিনি বহুদিন রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির অভাব নেই। দেশের প্রতিটি সৎ কাজ এবং সাধু প্রচেষ্টার পিছনেই তাঁর ঐকান্তিক শুভেচ্ছা থাকে। তাঁর উদার মহৎ চরিত্রের গুণে তিনি দেশবাসী মাত্রেরই প্রিয়। মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে ভারতের সকল নেতাই মালব্যজীকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। তিনি আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে ভারতকে মুক্তি-সংগ্রামে জয়ী দেখে যান—আমরা এই কামনাই করি।

লালা লাজপত রায়

লালা লাজপত রায় ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে "পাঞ্জাব-কেশরী" নামে সুপ্রসিদ্ধ। স্বাধীন ভারতে একদিন রণজিৎ সিংহও ঠিক একই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জীবনের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী সাধনার বলে লালা লাজপত রায় ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্তি

রেখে গেছেন, তাতে একথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর পাঞ্জাব-কেশরী নাম সার্থক। এমন নির্ভীক স্বদেশ প্রেমিক, আত্মত্যাগী মহদাশয় নেতা যে কোন দেশের পক্ষেই গৌরবের বিষয়। আধুনিক পাঞ্জাবের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তিনি যে অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন, সে কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার জাগ্‌রাঁও নামে ছোট একটি সহরে লালা লাজপত রায়ের জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিতে অগ্রবাল সম্প্রদায়ের বৈশ্য পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তাঁর ছেলেবেলা দারিদ্রের মধ্যেই কেটেছিল। জীবনে লালাজী নিজ হাতে নিজের ভাগ্য তৈরী করেছিলেন। তাঁর পিতা লাল রাধাকৃষ্ণন ছিলেন সে যুগের একজন উল্লেখযোগ্য লোক এবং প্রথমে তিনি ছিলেন গভর্ণমেণ্ট স্কুলের উর্দুর শিক্ষক। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্ম শিক্ষার প্রভাবে আসেন। তিনি নিজে শিক্ষক এবং শিক্ষা-প্রিয় ছিলেন বলে ছেলেকেও ভাল ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে লালাজী লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে দুবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ভোগ করেছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে ছোট সহর হিসারে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জ্ঞানার্জন-স্পৃহা লালাজীর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট ছিল। তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছিল। তিনি জীবনের প্রথমেই লালা হংসরাজ, গুরুদত্ত বিদ্যার্থী প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ধরণের লোক ছিলেন—কিন্তু প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চ নদের

দেশ পাঞ্জাবের উন্নতি করা। লালা লাজপত তাঁর জীবনের শেষভাগে নিজের আদর্শে এমন একদল যুবক কর্মীকে তৈরী করে রেখে গেছেন, যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ধরণে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে আজ দেশের অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব কর্‌ছেন।

লালাজী তাঁর উৎসাহ, অধ্যবসায়, সততা ও বাগ্মিতার গুণে শীঘ্রই আইন-ব্যবসায়ে প্রচুর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি হিসারের আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করে লাহোরে চলে এলেন। ছোট সহর হিসারেও কিন্তু তিনি এতদিন চুপ চাপ বসে থাকেন নি। জনসাধারণের কাজে এইখানেই তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল। তিনি দয়ানন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা ছাড়াও আর্য সমাজ আন্দোলনের জন্যে অনেক কিছু করেছিলেন। লাহোরে এসেও তিনি আর্য সমাজ আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকটা তাঁরই প্রভাব এবং কাজের গুণেই যে পাঞ্জাবে আর্য সমাজ আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। লালা লাজপত রায়ের রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। এই সালে তিনি প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদের রাজনৈতিক মতাবলীর সমালোচনা করে অনেকগুলো খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই সালেই তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে যোগ দেন। লালা লাজপতের লেখা খোলা চিঠি গুলোতে দেখা যায় যে স্যার সৈয়দ আহম্মদের প্রথম জীবনের লেখা এবং রাজনৈতিক মতাবলীর প্রভাব তাঁর চরিত্রে খুব বেশী পড়েছিল। স্যার সৈয়দ শেষ জীবনে অনেকটা সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের লেখার মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তাঁর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক রচনাবলীর প্রভাব লালা

লাজপতের উপর খুব বেশী। এ ছাড়া ইটালীর স্বদেশ প্রেমিকদের কাহিনীও তাঁকে স্বদেশ-প্রেমে উজ্জীবিত করেছিল। উর্দুতে লেখা তাঁর ইটালীয় স্বদেশপ্রেমিক ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী এখনও সমগ্র পাঞ্জাবে অত্যন্ত বেশী জনপ্রিয়। তাঁর রচিত স্বাধীন মহারাষ্ট্রের নির্ভীক বীর প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবনীও প্রসিদ্ধ। তাঁর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট ছিল যে তিনি শুধু বড় চিন্তা করে কিংবা বড় বড় কথা বলেই ক্ষান্ত হতেন না—সেটাকে কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অনাথ বালক বালিকাদের ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ও তিনি একটি অনুরূপ আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি যেসব ত্রাণ-সমিতি স্থাপন করেছিলেন তাদের মধ্যস্থতায় মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা এবং পূর্ববঙ্গের প্রায় ২০০০ অনাথ বালকবালিকা উদ্ধার পেয়েছিল। ফিরোজপুরে অনাথ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদকরূপেও তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। এর কিছুদিন পরে তিনি প্রচার-কার্যের উদ্দেশ্যে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডে যান। ইংল্যাণ্ডে তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অনেক কাজ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বদেশী আন্দোলনে লালাজী উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন এবং এই সময় দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে অনেক ইংরেজী পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখতেন। স্বদেশী সম্বন্ধে তিনি একবার লিখেছিলেন: "আমার মতে স্বদেশী সম্মিলিত ভারতের সাধারণ ধর্ম হওয়া উচিত।"

জীবনের প্রথমেই কংগ্রেসের সঙ্গে লালাজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছর পরে এলাহাবাদে

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ জর্জ ইয়ুলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এর পর ক্রমে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গভীরতর হয়। কংগ্রেসের উন্নতির জন্যে তিনি তাঁর লেখনী, বক্তৃতা-শক্তি এবং নিজের আর্থিক শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। শীঘ্রই জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ লালাজীর বুদ্ধিবৃত্তি, আত্মত্যাগ এবং জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিলাতে ভারতের রাজনৈতিক অসুবিধা সম্বন্ধে প্রচার কার্য চালানোর জন্যে তিনি কংগ্রেস প্রতিনিধি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ তাঁর বিলাত যাওয়ার খরচের জন্যে ৩০০০৲ টাকা তুলেছিলেন। লালাজী কিন্তু এ টাকা গ্রহণ না করে নিজের খরচেই বিলাত গেছিলেন এবং এই তিন হাজার টাকা তিনি ছাত্র সমাজের উপকারের জন্যে দান করেছিলেন। বিলাতে তিনি প্রচার কার্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যে বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোখেলের সভাপতিত্বে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে লালা লাজপত রায় বাংলায় দমনমূলক সরকারী আইনের প্রতিবাদ সমর্থন করে একটি নির্ভীক তেজোব্যঞ্জক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এর পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সহসা ভারত থেকে লালাজীর নির্বাসন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই নির্বাসন-দণ্ডের ফলে তিনি সমগ্র ভারতে আরও বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। লালাজীর নির্বাসনের সুস্পষ্ট কোন কারণ আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে পাঞ্জাবের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে লালাজীর রাজনৈতিক

মতবাদের প্রচার ও প্রসারে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভীত হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে লালাজীর এই নির্বাসন অতি স্মরণীয় একটি ঘটনা। লালাজী এবং মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক স্বদেশসেবার জন্যে যে নির্যাতন ভোগ করতে সুরু করেন, ভারতের স্বদেশ প্রেমিকদের ভাগ্যে সে নির্যাতন-ভোগ আজও শেষ হয় নি। লালাজীর নির্বাসনে ভারতীয় জনগণ মোটেই মুষড়ে পড়েনি—বরং তাঁর নির্ভীক আদর্শ দেশবাসীদের স্বদেশপ্রেমের কাজে আরও বেশী উজ্জীবিত করে তুলেছে। এখনও ভারতে সহস্র সহস্র স্বদেশপ্রেমিক দেশের জন্যে দশের জন্যে নীরবে নির্যাতন সহ্য করে চলেছেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সাফল্য-পূর্ণ অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এ নির্যাতন ভোগ শেষ হবে না। লালাজীর নির্বাসন-দণ্ডের সংবাদ শুনে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক নির্ভীক পিতা লালা রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন: "আমার পুত্র লাজপতের প্রধান অপরাধ এই যে তিনি তাঁর দেশবাসীদের পক্ষ সমর্থন করতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মত একজন পুত্র আমার আছে বলে আমি আনন্দিত।" উপযুক্ত পুত্রের পিতার মতই কথা নয় কি?

লালাজীর নির্বাসনকালের বেশ কিছুটা কেটেছিল আমেরিকায়। তাঁকে প্রায় বারো বৎসর ভারতের বাইরে কাটাতে হয়েছিল। তিনি এই দীর্ঘকাল কিন্তু আলস্যে চুপচাপ করে কাটিয়ে দেন নি। তাঁর নির্বাসনের একটা সুফল এই হয়েছিল যে তিনি বিদেশে ভারতের জাতীয়তার পরিপোষক আন্দোলন সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। আধুনিক কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সঙ্গে বহির্জগতের যোগা-যোগ স্থাপিত করলেও, এ যোগাযোগের সূত্রপাত করেছিলেন লালা লাজপত রায়। তিনি আমেরিকায় ভারতের পক্ষে জোর প্রচার-কার্য চালিয়েছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাস করার সময় ভারতের সম্বন্ধে

অসংখ্য প্রবন্ধ এবং প্রচার-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। শোনা যায় যে লালাজীর নির্দেশে আমেরিকায় ১০ লক্ষেরও বেশী ভারতসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও প্রচার-পুস্তিকাদি রচিত হয়েছিল। তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' (Young India) নামক পুস্তক আমেরিকায় বহুল-প্রচলিত। এই পুস্তকে তিনি তরুণ ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার সুন্দর চিত্র বিদেশীদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে তখন একদিকে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশা আরেকদিকে লালাজীর প্রিয় জন্মভূমি পাঞ্জাবে সরকারী নির্যাতনে দেশবাসীদের তীব্র অসন্তোষ। নির্বাসনে লালাজীর কানে যখন এসব কাহিনী পেঁ ছাত, তিনি স্বদেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পুস্তকে এসম্বন্ধে একটি হৃদয়স্পর্শী বিবরণ আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গভর্ণমেণ্ট সহসা তাঁর প্রতি সদয় হয়ে উঠে তাঁকে স্বদেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে কাটিয়ে লালাজী ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তিনি ভারতের যুবসমাজের উদ্দেশ্যে একটি বাণীতে তাদের আত্মবিশ্বাসী আত্মসংযমী হতে এবং হিন্দুমুসলমান ঐক্য সংস্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন।

লালাজী যখন ভারতে ফিরে এলেন তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অসহযোগ আন্দোলনের সুরু হয়ে গেছে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নির্মম কাহিনী শুনে লালাজী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখন ভারতে মণ্ট্যাগুচেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসন-কার্যের সূত্রপাত। পাঞ্জাবে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদে লালাজী ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে স্থির করলেন। পাঞ্জাবের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে লালাজী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনেই কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি ঘোষিত হয়। গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে লালাজী তাঁর মত স্থির করে উঠতে না পারলেও, তিনি আন্দোলনের বাইরে থাকতে পারেন নি। স্বদেশ প্রেমের জন্যে শীঘ্রই তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়েছিল এবং বেশ কিছুকাল তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। এই কারাগারেই তাঁর ভীষণ অসুখ হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ অসুখের প্রভাব ভাল ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করায় তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান। রোগ থেকে কিছুটা সেরে ওঠার পরই তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

জীবনের শেষ কয় বৎসর লালাজী একটু বেশী পরিমাণে হিন্দু মহাসভার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু শৈশব থেকে যে কংগ্রেসকে গড়ে তোলায় তিনি সাহায্য করেছিলেন, সে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর প্রীতি একটুও কমে নি। হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়ে হিন্দু সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করলেও লালাজীর মধ্যে গোঁড়ামী ছিল না। তাঁর স্বদেশপ্রীতি এবং জাতীয়তা-বোধ মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। তিনি কলিকাতার হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি শ্রমিক আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ঝরিয়ায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি

ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম-সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিলেন। লালাজী জীবনে অনেক পুস্তকাদি লিখে গেছেন। তাঁর কয়েকখানির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এইবার তাঁর আর একখানি প্রসিদ্ধ বইয়ের কথা বলি। এখানি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। মিস্ মেয়ো ভারত সম্বন্ধে কুৎসা-পূর্ণ 'মাদার ইণ্ডিয়া' (Mother India) নামক পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই পুস্তকের তীব্র প্রতিবাদ করে লালাজী লিখেছিলেন "আনহ্যাপি ইণ্ডিয়া" (Unhappy India)। এই পুস্তকখানি ভারতবাসী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

এইবার লালা লাজপত রায়ের অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা আলোচনা করেই তাঁর জীবন-কাহিনী শেষ করি। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর। এই সময়ে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্যে বিলাতের সাইমন কমিশন আসেন। সমগ্র প্রদেশে তখন এই সাইমন কমিশনকে বয়কট করার আন্দোলন চলছে। উক্ত তারিখে লালাজী লাহোরে সাইমন কমিশন বয়কটের জন্যে একটি বিরাট শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেন। পুলিশ সেই শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালায়। পুলিশের লাঠির আঘাতে লালাজী আহত হন। শেষ বয়সে কারামুক্তির পরে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—একথা পূর্বেই বলেছি। পুলিশের লাঠির আঘাতে লালাজী সেই যে অসুস্থ হয়ে পড়েন, সে অসুস্থতা আর ভাল হয় না। ক্রমে তাঁর হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেও লালাজীকে রোগ-মুক্ত করতে পারেন না। প্রায় আঠারো দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগের পর ভারতের এই বীর সন্তান ৬৩ বৎসর বয়সে ১৭ই নভেম্বর হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর এই

অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। মানুষ মাত্রেরই মরণ হয়। কিন্তু এমন শহীদের মৃত্যু খুব কম লোকেরই হয়। লালা লাজপত রায় আজ আমাদের মধ্যে নেই বটে—কিন্তু ভারতের সামনে তিনি যে উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন, সে আদর্শ ভারতের অগণিত নরনারীর বুকে স্বাধীনতার আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষিত, অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই কাছে মহাত্মা গান্ধী নামটি সুপরিচিত। ভারতের অগণিত নরনারী প্রতিদিন নীরবে এই নামটির উদ্দেশ্যে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। মহাত্মা গান্ধী শুধু বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজন মান্য নেতা নন—তিনি সমগ্র দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব। তাঁর রাজনৈতিক মতাবলী কিংবা ভাবধারার সঙ্গে অনেকেরই মতের অমিল থাকতে পারে এবং আছেও; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক গুণ, দেশের জন্যে আত্মত্যাগ এবং সুচিন্তিত জীবন-দর্শনকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দেহের দিক থেকে গান্ধীজী ক্ষুদ্রকায় এবং দুর্বল; কিন্তু তাঁর মত মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। আজীবন কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে গান্ধীজী এই অপরিসীম মানসিক বলের অধিকারী হয়েছেন। তিনি পাশবিক বলের বিরুদ্ধে পাশবিক বল প্রয়োগ করতে নারাজ; পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে তিনি মনের দৃঢ়তা

এবং আত্মার শক্তিকেই নিয়োজিত করে থাকেন। জীবনে এই নতুন অহিংস অস্ত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে গান্ধীজীকে দেশের এবং দশের জন্যে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে—অনেক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও স্বদেশ-প্রীতির বহ্নি নিস্তেজ কিংবা নিষ্প্রভ হয় নি। আজ ৭৬ বৎসর বয়সেও তিনি হিমালয়ের অটুট ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে কায়োমনে দেশ সেবা করে চলেছেন। বাল্যজীবন বাদ দিলে গান্ধীজীর কর্মজীবনকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন এবং ভারতের জীবন। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত জীবনের প্রায় সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল তিনি কাটিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়—প্রবাসী ভারতীয়দের সুখদুঃখের বোঝা বয়ে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে গান্ধীজী স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বাস করছেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত।

মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পশ্চিম ভারতের পোরবন্দর নামে দেশীয় রাজ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর পিতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা কাবা গান্ধী বেশী লেখাপড়া না জানলেও নিজের সততা, চরিত্রগুণ এবং অধ্যবসায়ের গুণে একাধিক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। গান্ধীজী জাতিতে বৈশ্য সম্প্রদায় ভুক্ত বানিয়া। গান্ধীর মাতা ছিলেন দানশীলা ধর্মপরায়ণা মহিলা। পিতার চেয়ে মাতার চরিত্রের প্রভাবই গান্ধীজীর উপর বেশী। মায়ের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। তাঁর বাল্যজীবনের কয়েক বছর কাটে পোরবন্দরে এবং কয়েক বছর কাটে রাজকোটে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের

প্রচলিত নিয়মানুসারে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে গান্ধীজীর বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী ৺কস্তুরবা গান্ধী গান্ধীজীর চেয়ে কয়েক মাসের বড় ছিলেন। বিবাহের পরে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন রোগভোগের পর তাঁর পিতা দেহত্যাগ করেন। গান্ধীজীর জীবনে এই প্রথম শোক। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঁচে না। তিনি কিছুদিন ভবনগরে শ্যামলদাস কলেজেও যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া ভাল না লাগায় বাড়ীতে ফিরে আসেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে গান্ধীজী আজন্ম নিরামিষাশী। তবু বিলাত যাত্রার পূর্বে গান্ধীজীর নিষ্ঠাবতী মাতা পুত্রকে দিয়ে বারবার শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় গান্ধীজী মদ্যমাংসাদি স্পর্শও করবেন না। মাতৃভক্ত গান্ধীজী অক্ষরে অক্ষরে এ সত্য প্রতিপালন করেছিলেন। গান্ধীজী প্রায় ৪ বৎসর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। এই সময় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন এবং পরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। পর জীবনে গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তনের অভিযোগে গান্ধীজীর ব্যারিষ্টারী ডিগ্রী কেটে দেওয়া হয়। এ আদেশ রদের জন্যে তিনি আর কোন চেষ্টা করেন নি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসেন এবং এসেই শোনেন যে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে তাঁকে বিলাতে এ খবর দেওয়া হয় নি। ভারতে তিনি মাত্র বছর-খানেক ছিলেন। এই সময় তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় সুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁর বক্তৃতা দিতেই ভীষণ লজ্জা হ'ত।

এই সময় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার এক ভারতীয় মুসলমান ফার্মের আইন-উপদেষ্টার পদ পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

দক্ষিণ আফ্রিকা গান্ধীজীর জীবনে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিলনা এবং তখন পর্যন্ত তাঁর চরিত্রে কোন রাজনৈতিক জ্ঞানেরও বিকাশ দেখা যায় নি। শ্বেতাঙ্গরা কালাআদমী ভারতীয়দের কিরূপ ঘৃণা করে—তার প্রথম নিদর্শন গান্ধীজী দেখলেন শ্বেতাঙ্গশাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতির জন্যে ভারত থেকে অনেক ভারতীয় কুলি সেখানে আমদানী করা হয়েছিল। ট্রান্সভাল, ন্যাটাল প্রভৃতি দেশে অনেক ভারতীয় কুলি পুত্রপরিবার নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সূত্রে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীও দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ব্যবসায় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় ভারতীয়দের মানুষ বলেই গণ্য করত না। তাদের উপর যৎপরোনাস্তি অন্যায় অত্যাচার করা হত—শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হ'ত, এমন কি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তাদের ট্রেণের এক কামরায় ভ্রমণ করতেও দেওয়া হ'ত না। ট্রেণে এবং ঘোড়ার গাড়ীতে ভ্রমণ করতে গিয়ে গান্ধীজী একাধিকবার শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। স্বদেশবাসীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে গান্ধীজীর সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর মক্কেলরা মুসলমান ছিলেন—একথা পূর্বেই বলেছি। গান্ধীজী এই সময় মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিনি মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণ পাঠ করেন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁর মক্কেলদের মামলা কিছুদিন পরে আপোষে নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং গান্ধীজী দেশে ফেরার উদ্যোগ করেন। কিন্তু

এই সময় ন্যাটাল গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করায় প্রবাসী ভারতীয়দের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা তাদের পক্ষ হয়ে আন্দোলন চালানোর জন্যে গান্ধীজীকে আরও কিছু দিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে অনুরোধ করে। গান্ধীজী ভারতীয়দের পক্ষ হয়ে একখানি সুন্দর দরখাস্ত লিখে দেন। শীঘ্রই এই দরখাস্ত নিয়ে ন্যাটাল ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে এই বোধ হয় প্রথম দরখাস্ত। এই দরখাস্তের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর সাড়া পড়ে। পরে এই দরখাস্তে প্রায় ১০ হাজার ভারতীয়ের সই জোগাড় করে তৎকালীন ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড রিপণের কাছে পাঠানো হয়। তাদের নেতৃত্ব করার জন্যে ভারতীয়-সম্প্রদায় তখন গান্ধীজীকে মোটা মাইনে দিয়ে রাখতে চান। তিনি কিন্তু এতে আপত্তি জানান। এই সর্তে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে রাজী হন যে ভারতীয় ব্যবসায়ী ফার্মগুলো তাদের আইনের কাজকর্মে গান্ধীজীকে নিয়োগ করবে এবং তিনি অবসর সময়ে ভারতীয় জনমত গঠন করে ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলবেন।

এই যে রাজনৈতিক কাজে গান্ধীজীর হাতে খড়ি হল, সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর বিরাম নেই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ন্যাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজী শীঘ্রই তাঁর গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী কার্য কলাপের জন্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। শ্বেতাঙ্গদের কাছে ভারতীয় মাত্রেরই নাম ছিল "কুলি" এবং তারা গান্ধীজীকে বলত "কুলি" ব্যারিষ্টার। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাস ছয়েকের জন্যে ভারতে ফেরেন। সেই সময় ভারতে তিনি সভা সমিতিতে বক্তৃতা

দিয়ে ন্যাটালে ভারতীয়দের দুর্দশার চিত্র দেশবাসীদের সামনে তুলে ধরেন এবং এ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকাও প্রচার করেন। এই মাসেই তিনি পুত্র পরিবার নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পুনরায় রওনা হন। কিন্তু ভারতে তাঁর কার্যকলাপের কাহিনী শ্বেতাঙ্গদের কানে গেছিল এবং ডারবানের শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায় স্থির করেছিল যে জাহাজ থেকে গান্ধীজীকে নামতে দেওয়া হবে না। পোতাশ্রয়ে কয়েকদিন অপেক্ষার পর যদিও শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হয়েছিল, তবু তাঁকে শ্বেতাঙ্গদের হাতে ভীষণ লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। বুয়োর যুদ্ধের সময় গান্ধীজী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন এবং নিজের উদ্যোগে একটি ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স গঠন করেন। এ বুয়োর যুদ্ধের শেষেও কিন্তু ভারতীয়দের অবস্থার কোন উন্নতি হল না—বরং বর্ণ-বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেল এবং ভারতীয়-বিরোধী নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হল। ন্যাটালে ভারতীয় জনমতের প্রচারের জন্যে গান্ধীজী "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" (Indian Opinion) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর পরেও গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় সুদীর্ঘ বারো বৎসর ছিলেন। এই বারো বৎসর তাঁর জীবনে শুধু সংগ্রাম ও কারাবরণের ইতিহাস। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী কস্তুরবা গান্ধীও ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করে স্বামীর সঙ্গে একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন। পর জীবনে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন করে গান্ধীজী ভারতের রাজনীতিতে যুগান্তর এনেছিলেন, তার সূত্রপাত এবং অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বিলাতে দরবার করার জন্যেও গান্ধীজী একাধিকবার ইংল্যাণ্ডে গেছিলেন। বুয়োর যুদ্ধের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা

যখন ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অধীনে স্বায়ত্তশাসন পেল, তখনও ভারতীয়-দের কোন অবস্থান্তর হল না। জেনারেল স্মাট্‌সের দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গান্ধীজী একাধিকবার অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এই সব সংগ্রাম খুব সাফল্য-মণ্ডিত না হলেও স্মাট্‌স্ গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ গান্ধী-স্মাটস্ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে সাময়িকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পরে পরেই গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন শেষ। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয় বিদ্বেষ আজ পর্যন্ত বিদূরিত হয় নি। এখনও স্মাটস্ সাহেবই দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার আছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত গান্ধী-স্মাটস্ চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করেন নি। তবে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি সর্বপ্রথম প্রবাসী ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা এনে দিয়েছিলেন—তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতীয়রা আজও স্মাটস্ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণের জন্যে আপ্রাণ লড়াই করে চলেছে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল ভারতীয়ই গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থক। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা এখনও সশ্রদ্ধ চিত্তে গান্ধীজীর স্বার্থত্যাগ এবং নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ড রওনা হন। সেই সময় বিগত মহাযুদ্ধের আরম্ভ। ইংল্যাণ্ডে এসে তিনি একটি ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্স গঠনে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সহসা প্লুরিসিতে আক্রান্ত হওয়ায় ডাক্তাররা তাঁকে ভারতে ফিরে যাবার উপদেশ

দিলেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে এইবার গান্ধীজীর কাজ সুরু হল। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরে এলেন এবং আহমদাবাদের নিকটে ওয়ার্ধায় সত্যাগ্রহ আশ্রম সংস্থাপন করেন। কস্তুরবা গান্ধী হলেন প্রথম আশ্রম-বাসিনী নারী। তিনি এসে সমগ্র ভারতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি প্রেরণ বন্ধ করার জন্যে আন্দোলন সুরু করলেন। প্রায় এক বছর আন্দোলন চলার পরে ফল দেখা গেল। দ।ক্ষণ আফ্রিকায় ভারতীয় কুলি-প্রেরণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এই সময় গান্ধীজীর জীবনে আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। তিনি আহ্‌মদাবাদের মিল শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্যে সর্বপ্রথম অনশন করেন। অনশনকে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের অন্যতম প্রধান অস্ত্র বলে মনে করেন। এর পর তিনি একাধিকবার এই অনশন করেছেন। বিহারের চম্পারণ জেলার নীলচাষীদের দুর্দশার প্রতিকারে এবং কৈরা জেলার চাষীদের খাজনা বন্ধ আন্দোলনে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করেন। এ দুটি আন্দোলনই সাফল্য লাভ করেছিল। ভারতে এই বোধ হয় সর্বপ্রথম বড় রকমের কৃষক আন্দোলন। চম্পারণ ও কৈরায় কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে গান্ধীজী দরিদ্র ভারতীয় কৃষক সমাজের দুর্দশার সঙ্গে মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। সেই থেকে ভারতীয় কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার গান্ধীজীর জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি নিজের জীবনের মধ্যেও ভারতীয় কৃষকের দারিদ্রকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত খদ্দর পড়ে স্বল্প ব্যয়ে মহাত্মাজী কিরূপ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন—সেকথা আজ বিশ্ব-বিদিত। গত মহাযুদ্ধেও গান্ধীজী নানাভাবে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর মনে আশা ছিল যে ভারতীয়দের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হয়ত তাদের অনেকটা স্বায়ত্ত

শাসন দেবেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্যে গান্ধীজী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডেল পেয়েছিলেন। পরে জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে গান্ধীজী প্রতিবাদে এ মেডেল ত্যাগ করেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর গান্ধীজী যে আশা স্থাপন করেছিলেন সে আশা ভাঙতে বেশী দেরী হল না। শীঘ্রই রাউলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদে সমগ্র ব্রিটিশ ভারত মুখর হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে তুরস্কের সমর্থনে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন সুরু হয়েছিল। গান্ধীজী নিজেও খিলাফৎ আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের সাহায্য লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপন গান্ধীজীর জীবনের অন্যতম আদর্শ ও স্বপ্ন। এই সময় তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের একটা বোঝাপড়া প্রায় করে এনেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা স্থায়ী হয় নি। তবে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক মুসলমান গান্ধীজীর ভক্ত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের মুসলমান সমর্থকও অনেক বেড়ে গেছিল। গান্ধীজী এই সময় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তার মারফৎ নিজের রাজনৈতিক মতামত সাধারণ্যে প্রচার করতে থাকেন। ভারতীয় মুসলমানরা আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলন সুরু করেছিল এবং তার পিছনে গান্ধীজীর সক্রিয় সমর্থন ছিল। তখনও খিলাফৎ আন্দোলন চলেছে। দেশব্যাপী রাউলাট আইনের প্রতিবাদে হরতাল হল। পাঞ্জাবে গভর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করলেন। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে পুলিশ জনতার উপরে গুলি চালাল। সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হল। সমগ্র ভারতবর্ষ এই অন্যায়

অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। এ সম্বন্ধে তদন্তের জন্যে একটি সরকারী তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার সঙ্গে সহযোগিতা করে নি। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে একটি ভিন্ন তদন্ত কমিটি নিয়োজিত হয়েছিল। এই কংগ্রেস তদন্তকমিটির বর্ণনাই দেশবাসীরা গ্রহণ করেছিল। এই সব ঘটনার ফলে গান্ধীজী ক্রমশ ব্রিটিশদের ন্যায়পরতা এবং সততার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে মণ্ট্যাগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে ভারতে যে সব নতুন আইনসভা স্থাপিত হ'ল, সেগুলোতে দেশপ্রেমিক দেশ-বাসীদের প্রবেশ বন্ধ করবেন বলে গান্ধীজী মনস্থ করলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগের নির্দেশ দিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি গৃহীত হল। এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল, সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর পরে সে যোগাযোগ আজও অটুট আছে। গান্ধীজী এসে কংগ্রেসের রাজ-নীতির মোড় ফিরিয়ে দিলেন। ভারতীয় কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত শুধু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন নিবেদন নিয়েই ব্যস্ত ছিল। গান্ধীজী কংগ্রেসকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামালেন। তাছাড়া তাঁর সুবিশাল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রভাবে ভারতীয় জনসাধারণের সাথে—নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক মজদুরদের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগা-যোগ সংস্থাপিত হল। ভারতীয় কংগ্রেস হল ভারতীয় জনমতের সত্যিকার প্রতীক। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের জয়যাত্রা সুরু হল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সবাই এসে যোগ দিল—দলে দলে লোক কারাবরণ করল, দেশব্যাপী ধর্মঘট হল। গান্ধীজী দেশব্যাপী বিদেশী

বস্ত্র বর্জন করে স্বদেশী খদ্দর পরিধানের আন্দোলনও সুরু করলেন। দেশবাসীদের স্বদেশ-প্রীতি জাগানোর জন্যে প্রকাশ্যে বিদেশী বস্ত্রে অগ্নি-সংযোগ করা হ'ল। কিন্তু এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সার্থক হল না। তিনি যে অহিংস উপায়ে গভর্ণমেণ্টকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন, সে পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত হল না। অনেক স্থানে হিংসার প্রকাশ দেখা গেল—দাঙ্গা হাঙ্গামা হল। অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন এবং সবরমতী আশ্রমে ফিরে গেলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হল। বিচারের সময় গান্ধীজী আত্মপক্ষ সমর্থনে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি সুদীর্ঘ এবং উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেছিলেন। কার্যত গান্ধীজীকে দুবৎসরের বেশী কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় নি। পুণার যারবেদা জেলে থাকার সময় তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন; পরে পুণা হাসপাতালে তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করা হয়। এর পর তাঁকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময় দেশে হিন্দু মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান বিরোধের সূচনা দেখে গান্ধীজী মর্মাহত হন এবং এর প্রতিবাদে অসুস্থ শরীরেই দিল্লীতে অনশন সুরু করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী সর্বসম্মতিক্রমে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় কংগ্রেস কার্যত গান্ধীজীর নীতি এবং নেতৃত্বই মেনে চলেছে। তিনি কিন্তু এই একবারের বেশী কংগ্রেসের সভাপতি পদে বসেন নি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরে তিনি "হরিজন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। গান্ধীজী কর্তৃক 'হরিজন' নামে অভিহিত

অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নতি এই পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, এ পত্রিকাখানি গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতামতেরও মুখপত্র ছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর "হরিজনের" প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধীজী চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনি নানারূপ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; তার মধ্যে চরকা আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলন এবং পল্লী উন্নয়ন আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী তাঁর জীবনের দ্বিতীয় আন্দোলন স্থরু করেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। এই আন্দোলনই আইন অমান্য আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। গভর্ণমেণ্টের লবণ-তৈরী আইন ভঙ্গ করে তিনি এই আন্দোলন স্থরু করেন। গান্ধীজী ১২ই মার্চ তারিখে আশ্রম থেকে একদল শিষ্যসহ সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁরা পায়ে হেঁটে একমাসে সমুদ্রতীরবর্তী দণ্ডীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। পথে গ্রামে গ্রামে গান্ধীজী গ্রামবাসীদের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। লবণ তৈরী গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার। দণ্ডীতে লবণ তৈরী করে গভর্ণমেণ্টের আইন ভঙ্গ করায় তিনি গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং বিনা বিচারে সরকারী আটকবন্দী হন। সারা দেশে আইন অমান্যের হিড়িক পড়ে যায়—দলে দলে স্বদেশপ্রেমিকরা কারাবরণ করেন। গভর্ণমেণ্টও কঠোর হস্তে দমনমূলক আইন প্রয়োগ করেন। এই যখন অবস্থা তখন বিলাতের বড়কর্তারা মনে করলেন যে ভারতকে আরও কিছু শাসনতান্ত্রিক অধিকার না দিলে চলে না। বিলাতে এ সম্বন্ধে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথমে এ বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হয় নি। পরে ১৯৩১ এর মার্চ মাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড

আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজীর গান্ধী-আরউইন চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হন এবং বড়লাটও দেশের বুক থেকে সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা তুলে নিতে রাজী হন। কংগ্রেসের একমাত্র মুখপাত্ররূপে গান্ধীজী বিলাতের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর যোগদানে ফল হয় নি। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে দেখেন যে লর্ড আরউইনের পরবর্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডন গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এবং দমনমূলক আইন সৃষ্টি করে অনেক কংগ্রেস নেতাকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করেছেন। এ সময় গান্ধীজীর স্ত্রী কস্তূরবা গান্ধীও বারকয়েক কারারুদ্ধা হন। এ অবস্থায় গান্ধীজী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করায় ধৃত এবং কারারুদ্ধ হন। তাঁকে পুনরায় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে যারবেদা কারাগারে রাখা হয়। ভারতীয় শাসন-সংস্কারে এই সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের কথা ঘোষিত হয়। এই রোয়েদাদে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধরা হয়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে গান্ধীজী কারাগারেই আমরণ অনশন সুরু করেন। তখন বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতারা সম্মিলিত হয়ে পুণা চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে চুক্তি মেনে নেওয়ায় গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পরেই গান্ধীজী মুক্তি পান। আইন অমান্য আন্দোলন তখন শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীজী তখন কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর প্রিয় সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নতুন ভারত শাসনতন্ত্র কার্যকরী হলে বেশীর ভাগ প্রদেশেই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের প্রথম বিরোধ বাধে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জার্মাণীর যুদ্ধ-

ঘোষণার পর। কংগ্রেস তখন ব্রিটিশদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানতে চায় এবং ভারতকে কবে স্বাধীনতা দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণাবাণী শুনতে চায়। গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী একযোগে পদত্যাগ করে। ফলে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে অনেকভাবে কংগ্রেসকে দলে টানার চেষ্টা হয়, কিন্তু ফল হয় না। কংগ্রেসের একমাত্র দাবী: ভারত শাসনে আমাদের প্রকৃত অধিকার দাও, ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন কর, তবেই আমরা ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করব—নচেৎ নয়। এমনই ভাবে দুবৎসর কেটে যায়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে এবং দেখতে দেখতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয় এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ দখল করে বসে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সহসা ভারতের দাবী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মারফৎ এপ্রিল মাসে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু যুদ্ধকালে ভারতে প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের কোন ব্যবস্থা আলোচ্য প্রস্তাবে না থাকায়, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলই ক্রিপ্‌স প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। ভগ্ন মনোরথ স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ দেশে ফিরে যান। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর কংগ্রেস আবার নতুন করে স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু করার সঙ্কল্প করে এবং জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্তে আবার আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব গান্ধীজীর উপর দেয়া হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আন্দোলনের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু আন্দোলন সুরু হবার আগেই ৯ই

আগষ্ট প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ধরা পড়েন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে গান্ধীজীর পত্নী কস্তূরবাও ধরা পড়েন। স্বামীর সঙ্গে তাঁকে পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে আটক রাখা হয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলায় পুলিশের সঙ্গে জনতার অনেক সংঘর্ষ হয়। সারা দেশব্যাপী ধরপাকড় চলে এবং সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আগা খাঁ প্রাসাদে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী ২১ দিন ব্যাপী অনশন পালন করেন। সমস্ত দেশব্যাপী গান্ধীজীর মুক্তির জন্যে আন্দোলন চলে—কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অটল ছিলেন। এই সালেই গান্ধীজী তাঁর প্রিয় সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে হারান। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী তাঁর জীবনের দারুণতম শোক পান। এই দিন আগা খাঁ প্রাসাদে হৃদরোগের আক্রমণে বন্দিনী কস্তূরবা গান্ধী ৭৫ বয়সে দেহত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ ৬১ বৎসর ধরে যিনি গান্ধীজীর সঙ্গিণী ছিলেন, যিনি আজীবন তাঁকে কর্মে প্রেরণা দিয়ে এসেছেন—শুধু তাই নয়, স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মত থেকে যিনি দেশের জন্যে দশের জন্যে সমস্ত দুঃখ নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেছেন, সেই নারী-রত্নকে হারিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে শোকাভি-ভূত হয়ে পড়বেন এটা ত খুবই স্বাভাবিক। শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমগ্র জগত থেকে গান্ধীজী তাঁর এই শোকে সান্ত্বনা-বাণী পেয়েছিলেন। কারাগারে গান্ধীজীর নিজের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। তার উপর এই মানসিক আঘাত। এই ঘটনার মাস তিনেক পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সহসা গান্ধীজীকে বিনা সর্তে মুক্তি দেন। মুক্তি পাবার পরেই গান্ধীজী হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্যে পরম উৎসাহে

ব্রতী হন। হিন্দু মুসলমান মিলন তাঁর আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। তাই বোম্বাইতে যখন অক্টোবর মাসে গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেবের মধ্যে উনিশ দিনব্যাপী আলোচনার সূত্রপাত হয়, তখন অনেকেই আশা করেছিল যে এবার বোধ হয় কংগ্রেস-মুসলিম লীগ মিলন হবে। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের বিরোধ দেখিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করে থাকেন। প্রধানত গান্ধীজীর আগ্রহে এবং উদ্যোগেই গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু জিন্না সাহেবের অযৌক্তিক এবং অন্যায় দাবীর জন্যে শেষ পর্যন্ত এ অলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবু আশাবাদী মহাত্মাজী কিন্তু হিন্দু মুসলমান মিলন সম্বন্ধে হতাশ হন নি। বিগত ২রা অক্টোবর গান্ধীজী ৭৫ বৎসর পার হয়ে ৭৬ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। এ উপলক্ষে সমগ্র জাতি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। গান্ধীজী বর্তমানে আবার কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ যেসব নেতা—তাঁরা আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

গান্ধীজীর মত পুত্রকে বুকে ধরে ভারতজননী গৌরবান্বিতা। তিনি শুধু পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক নন; এই অহিংসার ঋষি হিংসাজর্জরিত বর্তমান পৃথিবীরও শিক্ষাগুরু। তাই পৃথিবীবাসীরা তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি আরও দীর্ঘায়ু লাভ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বচক্ষে দেখে যান—এই আমাদের একমাত্র কামনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মৌলানা আজাদ

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

জওহরলাল নেহেরু

সীমান্ত গান্ধী

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত জনপ্রিয় নেতার আবির্ভাব হয় নি—এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রায় বিশ বৎসর অতীত হতে চল্‌ল—কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর জনপ্রিয়তা আদৌ হ্রাস পায় নি। অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং ঐকান্তিক দেশপ্রীতির গুণে তিনি বাঙালী জাতির মনে যে প্রেম ও শ্রদ্ধার আসন দখল করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে শূন্য সে আসন আর কোন বাঙালী নেতা কোনদিন দখল করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় দেশবন্ধুর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ এবং মায়ের নাম নিস্তারিণী দেবী। দাশ পরিবার বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান পরিবার ছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্ম-ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন। ভুবনমোহন আইন-ব্যবসায়ী হলেও অবসর সময়ে সাংবাদিকতার চর্চা করতেন এবং গান লিখতেন। পরে চিত্তরঞ্জনের নিজের চরিত্রেও এ দুটি গুণের বিকাশ দেখা গেছিল। তিনি কঠোর রাজনৈতিক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সাংবাদিকতার চর্চা করতেন এবং কবিতাও লিখতেন। একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে কবিপ্রাণের সুনিবিড় স্পর্শ ছিল।

চিত্তরঞ্জন কলিকাতার লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পাশ করেন। এর কিছু পরেই তিনি আইন পড়ার জন্যে এবং আই-সি-এস্ পরীক্ষা দেবার জন্যে ইংল্যাণ্ড যান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন না। ১৮৯২

খৃষ্টাব্দে তিনি মিডল্ টেম্পল্ থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় তিনি কয়েকটি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন—বিশেষত পার্লামেণ্টের নির্বাচনে প্রথম ভারতীয় প্রতিযোগী দাদাভাই নৌরজীর সমর্থনে তাঁর বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী সুরু করেন—কিন্তু কয়েক-বছর তাঁর পশার জমে না। কিছুকাল তাঁকে দারুণ অর্থাভাবের মধ্য দিয়েও কাটাতে হয়। ক্ষীণ-স্বাস্থ্য ভুবনমোহন কয়েকটি ঋণ করেছিলেন। তার উপর তিনি আবার এক বন্ধুর জন্যে বহু টাকার জামিন হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনও পিতার সঙ্গে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর এই পিতৃ-বন্ধু জামিনের সর্ত পালন করতে অসমর্থ হওয়ায় ভুবনমোহন এবং চিত্তরঞ্জন উভয়েই আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন যে কত বড় সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায় যখন দেখি যে আর্থিক সামর্থ অর্জন করার পর তিনি পাই পয়সাটি পর্যন্ত এ ঋণ শোধ করে দেন। অথচ তখন এ ঋণ শোধ না করলে আইনের চোখে তিনি আদৌ দোষী হতেন না। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আর কোন লোকের চরিত্রে এরূপ উদারতা, সাধুতা এবং সদাশয়তার সন্ধান মেলে না। তাঁর এই সাধুতায় দেশবাসীরা মুগ্ধ হয়ে মুক্ত কণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করেছিল।

১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে—বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ এবং 'মালঞ্চ' ও 'মালা' নামে তাঁর দুখানি কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশ। এইখানে চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভা এবং তাঁর সংবাদিকতা-শক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর এ দুটি শক্তির আলোচনা ছাড়া দেশবন্ধুর জীবনী সম্পূর্ণ হতে পারে না।

রাজনৈতিক নেতা এবং আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর যে সুনাম ছিল তার আড়ালে চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রসিদ্ধি চাপা পড়ে গেছে। কবিতা রচনা চিত্তরঞ্জনের নেশা ছিল; তিনি কখনও একে পেশা হিসাবে বিবেচনা করতেন না। তাঁর রচিত কোন কোন কবিতা যে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর মধ্যে খুব উঁচু দরের মৌলিক কবি-প্রতিভা না থাকলেও, তাঁর মধ্যে প্রকৃত শিল্পী-সুলভ উদারতা, আন্তরিকতা এবং একনিষ্ঠা ছিল। তাঁর কবিতায় গম্ভীর চিন্তাশীলতা এবং নিবিড় হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাঁর কবিতার বিষয়-বস্তু সব সময়ই গুরু গম্ভীর—ভগবান, মানব-জীবন, প্রেম ও জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন তাঁর কাব্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাঁর হৃদয়াবেগের উষ্ণতায় এই সব প্রশ্ন মূর্ত হয়ে দেখা দেয়। তাঁর কবিতার মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস সন্নিবদ্ধ আছে বলা চলে। কিভাবে তাঁর মন থেকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক আদর্শ বিদূরিত হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি, নাস্তিকতা এবং আত্মপরতা দেখা দিয়েছিল—তাঁর প্রথম জীবনে রচিত কাব্যের মধ্যে সে কাহিনী আছে। তাঁর পরজীবনে রচিত কাব্যের মধ্যে আমরা দেখি বৈষ্ণব আদর্শের গভীর প্রভাব। রাজনীতি এবং সাহিত্য—এই উভয় ক্ষেত্রেই চিত্তরঞ্জন বিদেশী প্রভাব কাটিয়ে উঠে স্বাদেশিকতার দিকে ধীরে ধীরে মোড় ফিরেছিলেন। তাঁর অশান্ত আত্মা শেষ পর্যন্ত এসে বৈষ্ণববাদের প্রেম, প্রীতি ও ভক্তির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দেশের নাড়ীর সন্ধান পেয়ে দেশবাসীদের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্য-গ্রন্থ 'মালঞ্চে'র মধ্যে ভগবানের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল—তা পরে শান্ত হয়ে এসেছিল। তাঁর পরের কাব্য-গ্রন্থ

'কিশোর কিশোরী', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতির মধ্যে আমরা দেখি শান্ত সমাহিত বৈষ্ণব প্রেম ও প্রীতি। এর শ্রেষ্ঠ এবং সুমহান রূপ দেখা যায় "সাগর-সঙ্গীতে"র কবিতাবলীতে। 'সাগরে'র মধ্যে যেমন একই যোগে তরঙ্গসঙ্কুলতা এবং প্রশান্তি দেখা যায়,—কবির মনেও তেমনই আছে চাঞ্চল্য আর প্রশান্তি। 'সাগর-সঙ্গীতে'র অনেক কবিতাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে বলে আশা করা যায়।

দেশের সমস্ত সাহিত্য আন্দোলন এবং সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের গভীর সংযোগ ছিল। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। বাংলার গীতি কবিতা সম্বন্ধে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তা খুবই মনোজ্ঞ এবং চিন্তাশীল হয়েছিল। তিনি সংবাদিকতার প্রতিও যথেষ্ট মনোনিবেশ করতেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরমে'র তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক সঙ্ঘের অন্যতম সদস্য। সংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর সব চেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে 'ফরওয়ার্ড' ও 'নারায়ণে'র প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' ছিল বাংলার স্বরাজ্য দলের মুখপত্র—আর 'নারায়ণ' ছিল বাংলা মাসিক পত্র। 'ফরওয়ার্ড' বেশ কয়েক বছর ধরে গৌরবের সঙ্গে চলেছিল। পরে স্বরাজ্য দলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ডে'রও জনপ্রিয়তা গেছিল কমে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের জীবিতকালে 'ফরওয়ার্ড' ছিল অন্যতম জনপ্রিয় ইংরেজী দৈনিক। সাহিত্যরসপিপাসু চিত্তরঞ্জন কিন্তু ইংরেজী দৈনিক সম্পাদনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাই তিনি সাহিত্য-মাসিক 'নারায়ণ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত এই বাংলা মাসিকখানির অকাল মৃত্যু হয়।

আইনজীবী হিসাবে চিত্তরঞ্জন প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন ১৯০৮

খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের (অধুনাখ্যাত শ্রীঅরবিন্দ) মামলায়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সুরু হয়। আন্দোলন দমনের জন্যে গভর্ণমেণ্ট অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন সে সময়ের শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদক। রাজদ্রোহের অপরাধে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাঁর বিচার হয়। চিত্তরঞ্জন ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের পক্ষের ব্যারিষ্টার। তাঁর অপূর্ব আইন-জ্ঞান এবং বাক্-চাতুর্যে তিনি এই সময় দেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এইবছরের মানিকতলা বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জন সমগ্র দেশের হৃদয় জয় করেন। মানিকতলা বোমার মামলা ভারতের রাজনৈতিক বিচারের ইতিহাসে অন্যতম চমকপ্রদ ঘটনা। মজঃফরপুরে একটা বোমা দুর্ঘটনার ফলে পুলিশ অনুসন্ধান করে কলিকাতার মানিকতলায় একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। ৩৬ জন বাঙালী যুবককে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম নেতা ছিলেন বলে, তাঁকেও বিচারার্থে উপস্থিত করা হয়। অনেকদিন এই মামলা চলেছিল; দুইশর চেয়েও বেশী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল, প্রায় চার হাজারের মত দলিল দস্তাবেজ হাজির করা হয়েছিল এবং বোমা, পিস্তল প্রভৃতি ৫০০ প্রকারের যন্ত্রাদি প্রদর্শিত হয়েছিল। কার্যত এক পয়সা না নিয়েই চিত্তরঞ্জন আসামীদের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করে নিজের আইন-জ্ঞান এবং তর্কশক্তির প্রমাণ দিয়েছিলেন। এই মামলার আসামীদের কার্যকলাপ যতই আপত্তিকর হোক, জাতীয়তাবাদী দেশবাসীরা তখন এঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে

উঠেছিল। ফলে এই মামলার আসামী পক্ষ সমর্থন করে চিত্তরঞ্জনও দেশবাসীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এই মামলা থেকেই চিত্তরঞ্জনের আইন-ব্যবসায়ে বিপুল সাফল্যের সূত্রপাত হ'য়েছিল। খ্যাতি এবং অর্থোপার্জনের দিক থেকে তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক সময় তাঁর বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকায় পর্যন্ত দাঁড়াত। এর পরেও চিত্তরঞ্জন বহু বহু বড় মামলা পরিচালনা করে সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ থেকে যে জাতীয় আন্দোলনের আরম্ভ, চিত্তরঞ্জন গোড়া থেকেই তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের মুখপত্র 'দি নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'বন্দে মাতরমে'র সঙ্গেও তাঁর গভীর সংযোগ ছিল। তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব রাজনীতিতে নামেন নি। এই সালে তাঁকে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই যে তাঁর সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল, সে যোগাযোগ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জনের প্রথমবারের অভিভাষণ হয়েছিল অত্যন্ত বেশী হৃদয়াবেগ এবং উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। এই অভিভাষণের মধ্যে সুগভীর চিন্তাশীলতা কিংবা রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় খুব কম। কিন্তু এই বছরই তিনি মণ্ট্যাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড কমিশনের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি এবং বাস্তব জ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক এই বছরই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে সভানেত্রী করা নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মতভেদের সৃষ্টি হয়। চিত্তরঞ্জন

বামপন্থী কংগ্রেসীদের পক্ষাবলম্বন করে এই বিরোধে অংশ গ্রহণ করেন। এই নিয়ে ভারতের কংগ্রেসে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তার ফলে নরম মতাবলম্বী দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের উদারনৈতিক দল সংগঠন করেন। উদারনৈতিক দলের সভ্যরা বেশীর ভাগই বয়সে প্রাচীন এবং উদার মতাবলম্বী কংগ্রেস সেবী ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক পথে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ না করে যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসন অর্জন করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে চিত্তরঞ্জন পূর্ব বঙ্গেও বহু স্থানে বক্তৃতা দিতে গেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে প্রচুর লোক সমাবেশ হ'ত। কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে শ্রীমতী বেশান্তের নেতৃত্বাধীনে উদারনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। এই বৎসর তিনি ভারতরক্ষা বিধির অন্তর্ভুক্ত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং কলিকাতার টাউন হলে একটি বিরাট জনসভায় তীব্র ভাষায় এই আইনের নিন্দা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের অবস্থা আরও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠল; এই বৎসরই অমৃতসরে পুলিশের অত্যাচার চলে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে কংগ্রেস যে কমিটি সংগঠন করেছিল, চিত্তরঞ্জন তার অন্যতম সদস্যরূপে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। এই কমিটিতেই তাঁর সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হয়। গান্ধীজী যখন ভারত-রক্ষা বিধির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁকে সমর্থন

করেছিলেন। রাউলাট আইন বড়লাটের সম্মতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় রবিবারে (৬ই এপ্রিল) সমগ্র ভারতব্যাপী পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই বৎসরই অমৃতসরের কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের চরমপন্থীদলের অন্যতম প্রধান নেতারূপে গণ্য হলেন। এঁরা মণ্ট্যাগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারকে ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, অসন্তোষ-জনক এবং হতাশাজনক বলে মনে করতেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসেও যেমন স্মরণীয় বৎসর, চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনই স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর সর্বব্যাপী অভ্যুদয়। কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী তাঁর পাঁচ দফা কর্মতালিকার প্রস্তাব পেশ করেন। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরিপূর্ণ অসহযোগই ছিল এই কর্মতালিকার মূল উদ্দেশ্য। চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলের মধ্যে থেকে সরকারী কার্যে বিরোধ-সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। তাই তিনি গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তবু কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। তিন মাস পরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কংগ্রেসের অসহযোগ-নীতি অনুসারে কাউন্সিল বর্জন, সরকারী কাজে ইস্তফা দান, আইন-ব্যবসায় ত্যাগ, স্কুল কলেজ বর্জন প্রভৃতি নির্দেশ দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন মনে প্রাণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন—নিজের লাভজনক আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়—তাঁর জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। বিলাসী চিত্তরঞ্জন একদিনে দেশের জন্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। ভারতের আর কোন নেতা চিত্তরঞ্জনের মত বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন কিনা সন্দেহ। কয়েক বৎসর পরে তিনি তাঁর বিরাট সম্পত্তি একটি মেডিক্যাল স্কুল ও নারীদের

জন্যে একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে দান করেন। তাঁর বিরাট আত্মত্যাগে সমগ্র দেশের হৃদয় এরূপ মুগ্ধ হয় যে, দেশবাসীরা তাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করে। দেশের জন্যে দেশবন্ধুর আত্মত্যাগের কথা বিবেচনা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

এই থেকেই চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের অব্যাহত অগ্রগতি সুরু হ'ল। তাঁর আহ্বানে সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজ ছেড়েছিল এবং আইন-জীবীরা ব্যবসায়-ত্যাগ করেছিলেন। দেশের অনেক স্থানে জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ঢাকাতে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসাম বেঙ্গল রেল কর্মীদের ধর্মঘট, আসামের চা বাগানের কুলিদের কর্মপরিত্যাগ এবং কংগ্রেসের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন। অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্যে কংগ্রেসের এক কোটি টাকা ও এক কোটি স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন ছিল। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সহস্র সহস্র যুবক স্বেচ্ছায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন নিষিদ্ধ করে আইন জারী করলেন। কংগ্রেস আইন অমান্য করে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করল এবং এই সিদ্ধান্তে খিলাফৎ কমিটিরও সমর্থন পেল। এই ভাবে গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হল, তার ফলে অনেককে কারাবরণ করতে হল। চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী, পুত্র এবং ভগ্নী ধরা পড়লেন এবং সরকারী বিচারে চিত্তরঞ্জনকেও ছয় মাসের জন্যে কারারুদ্ধ হতে হল। ইত্যবসরে তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি বিচারাধীন রাজবন্দী ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে সভাপতিত্ব করা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস কর্মীরা স্থানে স্থানে

হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন—কিন্তু শীঘ্রই নিজে কারারুদ্ধ হন। ১৯২২ এর জুলাই মাসে চিত্তরঞ্জন যখন মুক্তি পেলেন, তখন অসহযোগ আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তিনি বেরিয়ে এসে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করলেন। এই নীতি অনুসারে কংগ্রেস আইন সভার সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং আইন সভার ভিতর থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে আঘাত হানবে স্থির হল। ১৯২২ এর কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় চিত্তরঞ্জন তাঁর নতুন নীতি ঘোষণা করলেন; কিন্তু ভোটে তিনি হেরে গেলেন। এর পর তিনি তাঁর নতুন নীতির আদর্শে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় স্বরাজ্যদল গঠন করে ১৯২৩ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব চিত্তরঞ্জনের কাছে খর্ব হয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। বাংলায় অল্প সময়ের মধ্যে তিনি স্বরাজ্যদলকে এমনভাবে গড়ে তুললেন, যে কাউন্সিলে তাঁর দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করার আমন্ত্রণ পেয়েও স্বেচ্ছায় তা তিনি অবজ্ঞা করলেন এবং প্রতি পদে তাঁর দলের হাতে সরকার পক্ষের পরাজয় হ'তে লাগল। এমনই ভাবে মণ্ট্যাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারকে চিত্তরঞ্জন বিধ্বস্ত করলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের নতুন নির্বাচনেও তাঁরই দল পূর্ণ প্রাধান্য পেল এবং চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি মেয়ররূপে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সময় চিত্তরঞ্জন কার্যত বাংলাদেশের একনায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু তিনি কখনও একনায়কত্ব ভালবাসতেন না। তাঁর মন ছিল পুরোদস্তুর গণতন্ত্রের অনুরাগী। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে

মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ দার্জিলিংয়ে চিত্তরঞ্জনের দেহাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। শোকাচ্ছন্ন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে লেখেন ঃ

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

প্রকৃতই আধুনিক যুগে এই দানবীরের দানের তুলনা মেলে না। দার্জিলিং থেকে চিত্তরঞ্জনের শবদেহ কলিকাতায় এনে সৎকার করা হয়। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ তিন লক্ষ নরনারীর যে শোভাযাত্রা বের হয়, তার পুরোভাগে ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী।

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জনের সংগঠনশক্তি এবং সংগ্রাম-শক্তি ছিল প্রচুর এবং তিনি অত্যন্ত সুকৌশলী নেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় গুণ এই ছিল যে তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি লোকের মনে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগাতে পারতেন। তা ছাড়া তিনি হিন্দু এবং মুসলমান—এই উভয় সম্প্রদায়ের সমান বিশ্বাসভাজন নেতা ছিলেন। তাঁর মত আর কোন ভারতীয় হিন্দু নেতাকে মুসলমান সম্প্রদায় এমনভাবে বিশ্বাস করত না। তাঁর উদ্যোগে যে হিন্দুমুসলমান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তার মধ্যে চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের উদারতা এবং পরমত-সহিষ্ণুতা প্রতিফলিত। রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে তিনি তাঁর সময়ের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি শুধু ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুক্তির কথাই ভাবতেন না—ভারতীয় শ্রমিকদের মুক্তি-চিন্তাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। নিম্নোক্ত গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার অংশ বিশেষের মধ্যে আমাদের উক্তির সমর্থন মিলবে: "আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় জনগণের মধ্যে স্বরাজ আনবে। কোন শ্রেণী-আন্দোলন স্বরাজের

জন্যে আন্দোলনে পরিণত হ'তে পারে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।……বর্তমানে ভারতে যে শ্বেত আমলাতন্ত্রের শাসন চল্‌ছে, তার পরিবর্তে যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয় আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়, তবে ভারতের কি লাভ হবে?……জনগণ যদি স্বরাজপ্রাপ্তির জন্যে আমাদের সাথে সহযোগিতা না করে, তবে আমার স্বরাজের আদর্শ কখনও পূর্ণ হবে না। অন্য যে কোন প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিকরা যাকে বলে 'বুর্জোয়া' গভর্ণমেণ্ট তারই সৃষ্টি হবে।……আজ যদি সমগ্র ইউরোপ স্বাধীনতার যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তার কারণ এই যে ইউরোপের জাতিপুঞ্জ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে শক্তি সংগ্রহ কর্‌ছে। আমি ইউরোপীয় ইতিহাসের এই অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি এড়াতে চাই।" চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক জগতের যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার যাঁর উপর এসে পড়েছিল, তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনি আমরণ এ গুরু কর্তব্যের ভার সগৌরবে বহন করে গেছেন। সে সময়ে দেশবন্ধুর পরেই ছিল তাঁর খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা। দেশের জন্যে, দশের জন্যে প্রচুর আত্মত্যাগ এবং কারা-নির্যাতন ভোগ করেই তাঁকে এ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনে তিনি বহুবার অপূর্ব সংগঠন-শক্তির প্রমাণ দিয়েছিলেন। জন্ম থেকেই যতীন্দ্র

মোহনের রক্তে রাজনীতির বীজ ছিল বলা চলে। তাঁর পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী এবং স্বদেশ প্রেমিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাঁরা বাংলার সমাজ-জীবনে রাজনীতির সচেতনতা এনে দিয়েছিলেন, যাত্রামোহন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনিই চট্টগ্রাম জেলায় সর্বপ্রথম জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের বরমা গ্রামে যাত্রামোহনের পল্লীনিবাসে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। তাঁর মাতার নাম ছিল বিনোদিনী দেবী। জীবনের শেষ ভাগে যাত্রামোহন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলেও বিনোদিনী দেবী আজীবন হিন্দুধর্মেই আস্থাবতী ছিলেন। তিনি রীতিমত পূজা, জপতপ প্রভৃতি করতেন। যাত্রামোহন কখনও স্ত্রীর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করতেন না। ছেলে মেয়েদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনকেই বোধ হয় বিনোদিনী দেবী সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। পুত্রেরও মাতার প্রতি ভক্তির সীমা ছিল না। ছোটবেলা থেকেই যতীন্দ্রমোহনের দেহ বেশ বলিষ্ঠ সুগঠিত ছিল। তার উপর তিনি খেলাধূলো ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন। খেলাধূলো এবং ব্যায়মচর্চা অনেক সময় তাঁর লেখাপড়ায় ব্যাঘাতও সৃষ্টি করত। তাঁর বাবার প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল যে তিনি যতীন্দ্রমোহনকে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে ইংল্যাণ্ডে পাঠাবেন। চট্টগ্রামে থাকতে যতীন্দ্রমোহন একাধিক স্কুল বদল করেছিলেন; তারপর তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এখানেও পর পর একাধিক স্কুল বদল করে অবশেষে হেয়ার স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পড়ার সময় তাঁর বিলাত যাবার প্রস্তাব ওঠে। এত অল্প বয়সে পুত্রকে বিদেশে পাঠানোর ইচ্ছা মাতা

বিনোদিনী দেবীর একটুও ছিল না। বহুকষ্টে মাতাকে সম্মত করানোর পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যতীন্দ্রমোহন ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি কেম্ব্রিজের ডাউনিং কলেজে ভর্তি হন। লেখা পড়া ছাড়াও তিনি সেখানে সকল রকমের খেলাধূলো এবং বাগ্মিতার জন্যে ছাত্রমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ক্রিকেট, টেনিস হকি এবং দাঁড় টানায় তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের কলেজের সঙ্গে অন্যান্য কলেজের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় তিনিই দলের নেতা নির্বাচিত হতেন। সে সময় কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের কেম্ব্রিজ ভারতীয় মজলিস এবং প্রাচ্য প্রতীচ্য সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ছাত্রমহলে যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমিতি দুটির অধিবেশনে তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। এইভাবে তাঁর ভাবী জীবনের বাগ্মিতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা পরলোক গত গুরুসদয় দত্ত এবং আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিলাত প্রবাসের সময় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দেশে তাঁর মাতা বিনোদিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মাতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। মাতার মৃত্যুর কিছু পরে তিনি অল্পকালের জন্যে দেশে ফিরেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি কেম্ব্রিজের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গ্রেজ ইন্ থেকে ব্যারীষ্টারী সনদও পান। বিলাত প্রবাসের সময় তিনি গ্রে পরিবার নামক একটি মহৎ ইংরেজ পরিবারের সংস্পর্শে আসেন এবং পিতার অমত সত্ত্বেও তিনি এই পরিবারের কন্যা কুমারী নেলী গ্রের পানি গ্রহণ করেন। পর জীবনে ইনিই সুপ্রসিদ্ধা জন-নেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিবাহের পর তিনি

সস্ত্রীক ভারতে চলে আসেন। যাত্রামোহন পুত্রবধূর সংস্পর্শে এসে তাঁর মধুর চরিত্র এবং সেবাযত্নের গুণে নিজের পূর্বমত বদলাতে বাধ্য হন এবং পুত্র ও পুত্রবধুকে প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে যতীনন্দ্রমোহন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী সুরু করেন। প্রথম প্রথম তাঁর খুব অর্থাভাব চলতে থাকে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপন ল কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। এতৎ সত্বেও তাঁর অর্থাভাব কমে না। অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য যতীন্দ্রমোহনের জীবনে কোনদিন আসেনি। একসময় ব্যারিষ্টারীতে তাঁর মাসে ১০।১২ হাজার টাকা পর্যন্তও আয় হত। কিন্তু তিনি দেশের কাজের জন্যে নিজের আইন ব্যবসায়ের দিকে যথোচিত মনোনিবেশ করতে পারতেন না। তা ছাড়া তিনি অনেক সময় প্রচুর ঋণ করেও দেশের কাজে সহায়তা করতেন। এইবার আমরা যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি যে স্বদেশ-প্রেম ও রাজনীতি তাঁর রক্তকণায় মিশে ছিল। ভারতে ফেরার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। ঐ বৎসর ফরিদপুরে প্রাদেশিক জাতীয় সভার অধিবেশন হয়। যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামের প্রতিনিরূপে সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরই আহ্বানে পর বৎসর চট্টগ্রামে এই সভার অধিবেশন হয়েছিল। চট্টগ্রাম সম্মেলনে যাত্রামোহন ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং যতীন্দ্রমোহন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা। এর পর থেকে যেখানেই যেবার প্রাদেশিক সভার অধিবেশন হয়েছে, যতীন্দ্রমোহন তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই যোগ দিতেন। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করা তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করতেন। নিজের জেলায় তাঁর পিতার রাজনৈতিক খ্যাতি যথেষ্ট থাকলেও যতীন্দ্রমোহন তখনও জনসমাজে

স্বল্প পরিচিত। তিনি ইতিমধ্যেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং দেশবন্ধু তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন গুণ এবং আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি দেখে বুঝেছিলেন যে তিনি একদিন বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হবেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু একবার স্বদেশী কার্যোপলক্ষে চট্টগ্রামে গেছিলেন। সে সময় যতীন্দ্রমোহনও চট্টগ্রামে যান। দেশবন্ধুর আগমনে চট্টগ্রামে একটা বিরাট রাজনৈতিক সভা হয়। সেই সভায় দেশবন্ধু চট্টগ্রামবাসীদের কাছে তাদের স্বজেলাবাসী যতীন্দ্রমোহনের বিভিন্ন গুণাবলীর কথা বর্ণনা করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই যে দেশবন্ধুর প্রতি যতীন্দ্রমোহনের আনুগত্যের সূত্রপাত হল, সে আনুগত্য চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। নরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। নরমপন্থী দলের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজরা আবেদন নিবেদনের ফলেই ভারতীয়দের ধীরে ধীরে স্বাধীনতা দেবে, আর চরমপন্থীরা বলতেন যে স্বাধীনতা ইংরেজদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে হবে—সংগ্রাম করতে হবে। বিনা প্রচেষ্টায় ইংরেজ নিজের অধিকার কণামাত্র ছাড়বে না। নরমপন্থীদের প্রভাব দেশের বুক থেকে ক্রমশই কমে যাচ্ছিল। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রভাবে বাংলা থেকে তাঁদের শক্তি অচিরেই বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেল। যুদ্ধের শেষে মণ্ট্যাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের নামে ইংরেজরা ভারতকে যে তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন দিল, তার মোহজালে সুরেন্দ্রনাথের মত নেতাও ধরা পড়লেন। কিন্তু দেশবাসীরা তাতে সন্তুষ্ট হল না। তার উপর কুখ্যাত রাউলাট বিল নিয়ে ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সারা ভারতে আন্দোলন চলছিল। যতীন্দ্রমোহন তখন দেশবন্ধুর অন্যতম সমর্থক ও সহায়ক। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। বৃদ্ধ যাত্রামোহন সেই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ বিপুল সভার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুবে না বলে, পুত্র যতীন্দ্রমোহন তাঁর লিখিত অভিভাষণ উদাত্তকণ্ঠে পাঠ করেছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই ১৯১৯-এর শেষভাগে ৭০ বৎসর বয়সে যাত্রামোহন কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত গুরু কর্তব্যভার এসে পড়ে যতীন্দ্রমোহনের স্কন্ধে। ১৯২০-এর সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। যতীন্দ্রমোহন এই কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কংগ্রেসে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভোটাধিক্যে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায়। যতীন্দ্রমোহন চিত্তরঞ্জনের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু তাঁর মত পরিবর্তিত করেন এবং সদলবলে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দটি বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। এই বৎসর অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা গেছিল। চিত্তরঞ্জন চিরদিনের জন্যে তাঁর লাভজনক ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে যতীন্দ্রমোহনও তিন মাসের জন্যে আইন ব্যবসায় বন্ধ রেখে চট্টগ্রামে স্বদেশগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র তিন মাসের জন্যে ব্যবসায় বন্ধ করলেও, তিনি কার্যত এক বৎসর নয় মাস ব্যারিষ্টারী

করতে পারেন নি। এতে তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন চাষী মজুর ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এই সময় বার্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকদের একটি ধর্মঘট ঘটান। শ্রমিকরা বহুদিন থেকেই বিভিন্ন কারণে মালিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তারা তাদের অভিযোগ পূরণের দাবী জানিয়ে একযোগে ধর্মঘট করে। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাদের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে এই ধর্মঘট সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল। এর পরই যতীন্দ্রমোহনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের কথা আসে। এত বড় সার্থক ধর্মঘট ভারতে খুব কমই হয়েছে। ১৯২১-এর ২০শে মে চাঁদপুরে চা বাগানের কুলিদের উপর সরকারী অত্যাচার হয়। যতীন্দ্রমোহন তখন আসাম বেঙ্গল রেলকর্মচারীদের শক্তিশালী সঙ্ঘ 'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইউনিয়নের' সভাপতি। তিনি কুলিদের উপর অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে চাঁদপুরে উপস্থিত হলেন। এদিকে যতীন্দ্র-মোহনের অনুপস্থিতিতেই ২৪শে মে এই অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় ২৫ হাজার কর্মচারী ধর্মঘট করে বসল। রেল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের মাহিনাদি নিয়ে কর্মচারীদের যে অভিযোগ এতদিন পুঞ্জীভূত ছিল, তাই অবশেষে চাঁদপুরের ঘটনা অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে বসল। অবশেষে এ ঘর্মঘট ষ্টীমার কর্মচারীদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল। দেশবন্ধুর সহায়তায় চাঁদপুরের কুলিদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়ে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামে ফিরে এলেন এবং কর্মচারীদের তরফ থেকে তাদের অভিযোগের প্রতিকার দাবী করলেন। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কাজেই ধর্মঘটও চলল। ধর্মঘটিদের আর্থিক সাহায্যদানের

জন্যে যতীন্দ্রমোহন একটি অর্থভাণ্ডার খুললেন। কিন্তু ২৫ হাজার লোকের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন কি সহজ? তাই তিনি বাধ্য হয়ে ধর্মঘট চালু রাখার জন্যে ৪০ হাজার টাকা ঋণ করলেন। পরে এই ঋণ শোধ করতে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। ধর্মঘট চলতে থাকায় যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর উপর চট্টগ্রামে সভা, শোভাযাত্রা পরিচালনা নিষিদ্ধ করে আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু কয়েকদিন পরে কয়েকজন কর্মী গ্রেপ্তার হওয়ায় যতীন্দ্রমোহন আদেশ লঙ্ঘন করতে বাধ্য হলেন। তিনি প্রতিবাদে এক মাইল দীর্ঘ একটি শোভাযাত্রা বের করলেন। ফলে তিনি কয়েকজন সহকর্মীসহ গ্রেপ্তার হলেন এবং যথোচিত বিচারের পর ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পেলেন। কিন্তু আবার তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। ধর্মঘট তখন চলছে। দীর্ঘ তিন মাস ধরে ধর্মঘট চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ বিশেষ হল না। কর্তৃপক্ষ নতুন লোক নিয়োগ সুরু করলেন। তখন ভীত হয়ে অনেক পুরণো ধর্মঘটী কর্মচারী পেটের দায়ে কাজে যোগ দিতে লাগলো। এমনই ভাবে ধর্মঘট ভেঙ্গে গেল। আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে আর কোন ধর্মঘট এত ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে কিনা সন্দেহ।

চট্টগ্রামে যখন রেলকর্মীদের ধর্মঘট চলছিল, তখন মৌলানা মহম্মদ আলীর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য স্বচক্ষে দেখার জন্যে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশে এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য দেখে মুগ্ধ হন। যতীন্দ্রমোহন তখন চট্টগ্রামে রেলধর্মঘটীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করেন। গান্ধীজী সানন্দে সম্মত হন। চট্টগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যর্থনার জন্যে যতীন্দ্রমোহন যে বিরাট রাজকীয় আয়োজন

করেছিলেন, চট্টগ্রামের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী চট্টগ্রামে কংগ্রেসের কাজ এবং অসহযোগ আন্দোলনের খুব প্রশংসা করেন। কার্যত এটা যতীন্দ্রমোহনেরই প্রশংসা—কেননা চট্টগ্রামে কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলন সংগঠনের মূলে যতীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টাই ছিল মুখ্য। এই কাজে যতীন্দ্রমোহনের যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহিমচন্দ্র দাস, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মৌলবী কাজিম আলী, মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৫শে সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রমোহনের নিষেধাজ্ঞার কাল শেষ হয়ে যাবার পর তিনি গ্রেপ্তার হন। পরে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু অক্টোবর মাসে পুনরায় তাঁর বিচার হয়। ১৯শে অক্টোবর এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। বিচারে যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর উপর তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। যতীন্দ্রমোহনের এই প্রথম কারাদণ্ড। এই আদেশের ফলে চট্টগ্রামে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। সারা সহরে হরতাল প্রতিপালিত হল। কর্তৃপক্ষ যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর সহকর্মীদের চট্টগ্রামে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে তাঁদের কলিকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। ১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসের অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনের অভিযোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাদণ্ড হল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন স্থিরীকৃত হয়। দেশবন্ধু তখনও কারাগারে। যতীন্দ্রমোহন তখন কারামুক্ত এবং তিনি ইতিমধ্যেই দেশবাসীদের কাছ থেকে 'দেশপ্রিয়' আখ্যা পেয়েছেন। তিনি চট্টগ্রামে সম্মেলনের সকল বন্দোবস্ত করলেন। দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এই অধিবেশনের সভানেত্রী হয়েছিলেন।

চট্টগ্রাম সম্মেলনের প্রায় তিন মাস পরে দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন যে গান্ধীজী কারারুদ্ধ— দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ। তখন চিত্তরঞ্জন স্থির করলেন যে তিনি সদলবলে নতুন আইন সভায় প্রবেশ করবেন এবং ভিতর থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত করার চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠা করলেন। দেশবন্ধু এই পার্টির সভাপতি এবং মতিলাল সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধু এই বৎসর গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও গয়া কংগ্রেসে ভোটাধিক্যে তাঁর স্বরাজপার্টি গঠনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল। তবু তিনি হতাশ হলেন না। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দেশবন্ধুর প্রস্তাব গৃহীত হল। ইত্যবসরে যতীন্দ্রমোহন পুনরায় আইন-ব্যবসায় সুরু করেছিলেন। নিখিল ভারত স্বরাজপার্টি গঠন শেষ করে দেশবন্ধু বঙ্গীয় স্বরাজপার্টি গঠনে মন দিলেন এবং যতীন্দ্রমোহন প্রাদেশিক স্বরাজপার্টির সম্পাদকপদে নির্বাচিত হলেন। ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে বাংলায় যে নির্বাচন সংগ্রাম হল তাতে স্বরাজপার্টির অধিকাংশ সদস্য বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হলেন। চট্টগ্রাম থেকে যতীন্দ্রমোহনও আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টি গঠিত হল যতীন্দ্রমোহন তারও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেস স্বরাজ-পার্টির হাতে বাংলা গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটেছিল। অন্য কোন স্বাধীন দেশ হলে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করতে হ'ত। কিন্তু পরাধীন দেশ বলে বাংলা গভর্ণমেণ্ট পূর্ববৎ চালু ছিল। এই সময় বাংলা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হওয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশনের

অধিকার অনেকটা নাগরিকদের হাতে এসে পড়ল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজদলই কর্পোরেশন অধিকার করলেন এবং দেশবন্ধু হলেন কলিকাতার প্রথম কংগ্রেসী মেয়র। হঠাৎ ১৯২৫-এর ১৬ই জুন দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে বাংলার রাজনীতির আকাশে আবার দুর্দিনের ঘনঘটা দিল দেখা। মহাত্মা গান্ধী তখন বাংলায় ছিলেন। তিনি দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডার খুললেন। যতীন্দ্রমোহন তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে লাগলেন।

ক্রমে দেখা গেল যে চিত্তরঞ্জনের 'ত্রিমুকুট' গ্রহণ করার যোগ্যতা যতীন্দ্রমোহনেরই আছে—তিনি বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেস সেবীর বিশ্বাস-ভাজন। দেশবন্ধুর স্থলে তিনি বাংলার কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তারপর কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান এবং মেয়র নির্বাচিত হলেন। ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে কানপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল, তাতে স্বরাজপার্টিকে আইন সভা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হল—কেননা দেখা গেল যে আইন সভার ভিতর থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে কোন লাভ নেই। কংগ্রেসের নির্দেশে যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় স্বরাজপার্টি সহ ১৯২৬-এর ১৫ই মার্চ আইনসভা ত্যাগ করলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন আসামের সুর্মাভ্যালী রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা কত বেশী ছিল তার একটা পরিমাপ পাওয়া যায় তাঁর কলিকাতা কর্পোরেশনে পাঁচবার মেয়র পদ লাভ থেকে। আর কেউ এত অধিকবার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদ লাভ করেন নি। যতীন্দ্রমোহন ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ খৃস্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেয়র হিসাবে তিনি সকল রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থেকে যেরূপ নিরপেক্ষতার সঙ্গে

কলিকাতার নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন তা কর্পোরেশনের সকল দলের কাউন্সিলারদের সপ্রশংস সমর্থন লাভ করেছিল। এই সময় যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা যেমন বেড়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর একটা বিরুদ্ধবাদী দলও গড়ে উঠ্‌ছিল। এই দলগত ঈর্ষা ও হিংসায় তিনি অত্যন্ত মানসিক পীড়া অনুভব করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে এ দলাদলির যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সহনশীলতা ছিল অপরিসীম। ১৯২৬-এর ২রা এপ্রিল কলিকাতায় যে বিরাট হিন্দুমুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল তা নিবারণের জন্যে যতীন্দ্রমোহন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, কিরণশঙ্কর রায়, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ইত্যবসরে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলি পূর্বের মতই চলতে লাগল। কয়েক জন প্রসিদ্ধ বাঙালী কংগ্রেসকর্মী তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি একাধিকবার এঁদের সঙ্গে মিলন-প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিলের নতুন নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহনের কংগ্রেসী দল পূর্বের মত সাফল্য অর্জন না করলেও, তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রিমণ্ডলকে ভোটাধিক্যে পরাজিত করলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দেও মন্ত্রিমণ্ডল তাঁর দলের হাতে পরাজিত হলেন। গভর্ণমেণ্ট তখন বাধ্য হয়ে দুজনের পরিবর্তে তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করে মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থক সংখ্যা বাড়ালেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হল। গান্ধীজীর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিলেন—আর সুভাষচন্দ্র ভোট দিলেন বিপক্ষে। ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে পূর্ব বৎসরের প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব

গৃহীত হল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের ব্যয় সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর বিরোধী দলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল। তখন যতীন্দ্রমোহনের হাতে একখানা সংবাদপত্রও নেই। কাজেই তাঁর পক্ষে বিরোধী দলের অভিযোগের সম্যক জবাব দেওয়া কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় পড়ে যতীন্দ্রমোহন 'অ্যাডভান্স' নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিকের প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়। এই বৎসর মেয়র নির্বাচনের সময় সুভাষ বাবু যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রস্তাব করায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই বৎসরই চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। অথচ নিজের জেলার সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে দেশপ্রিয় কিছুই জানতেন না। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। জেলা সম্মেলনে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি পর্যন্ত হল। এই বৎসর নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের জন্যে সুভাষচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল। মাত্র কয়েক ভোটের জন্যে তিনি সুভাষ বাবুর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁর সমর্থকরা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে বিরুদ্ধবাদী দলের গোপন অবৈধ প্রচেষ্টার ফলেই তিনি পরাজিত হয়েছেন। অতএব নির্বাচন আইন-সঙ্গত হয় নি। তাই যতীন্দ্রমোহন প্রতিকারের জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ তদন্তের ভার দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত এম্. এস, অ্যানীর উপর। কিন্তু এর পর পরই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনে সমস্ত দেশ ক্ষেতে

উঠল বলে, এ তদন্ত বেশী দূর এগোয় নি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের থেকে যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যে অবনতি দেখা দেয় : তাঁর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। তিনি ডাক্তারদের উপদেশে সমুদ্রবায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালী এবং ব্রহ্ম-বাসীদের অনুরোধে রেঙ্গুনে ২।৪ দিন থাকেন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক বক্তৃতা করেন। মার্চ মাসে কলিকাতায় ফিরে আসার পর সহসা রেঙ্গুন পুলিশের আদেশে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলার এই বীর সন্তানকে বিরাট জনতা বিদায়-অভিনন্দন জানায়। রেঙ্গুনে বিচারে তাঁর প্রতি দশদিন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়। কারামুক্তির পর রেঙ্গুনে এবং ফিরে এসে কলিকাতায় তিনি জনগণের বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশ মুখর। ফিরে এসে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের এক ছাত্রসভায় নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠের অপরাধে তিনি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বৎসর কারাগারে থাকার সময় তিনি পঞ্চম বারের জন্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। কারামুক্তির পর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মনোনয়নক্রমে তিনি কারারুদ্ধ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্থলে অস্থায়ীভাবে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পরে জালিয়ানওয়ালাবাগে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দানের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লী আনা হয় এবং বিচারে তাঁর প্রতি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। এর কিছুদিন পরে তাঁর সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকেও দিল্লীতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর প্রতি ৪ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। বাংলায় এই সংবাদ পৌঁছানোর পর যতীন্দ্রমোহনের সম্মানার্থে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভা স্থগিত রাখা হয় এবং সহরে

আংশিক হরতাল প্রতিপালিত হয়। কার্যত যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর পত্নীকে এবার তিন মাসের বেশী কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি। কেননা ১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসে আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ২৭শে জানুয়ারী দিল্লী জেল থেকে সস্ত্রীক যতীন্দ্রমোহন মুক্তি পান।

যতীন্দ্রমোহনের কারামুক্তির কিছু পরেই গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুমোদনের জন্যে করাচীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অধিকাংশ প্রদেশের ভোটে যতীন্দ্রমোহন করাচী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা কিরূপ বেড়ে গেছিল এটা তারই প্রমাণ। কিন্তু দেশপ্রিয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনুকূলে তাঁর নিজের দাবী ত্যাগ করেন। ফলে সর্দারজীই করাচী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। এই বৎসর মে মাসে দেশপ্রিয় দক্ষিণ ভারতের কেরলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বৎসর যতীন্দ্রমোহনের নিজের জেলা চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর ভীষণ লুঠতরাজ হয়। যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে লুঠতরাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্যে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তিনি নিজে তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। চট্টগ্রামের ব্যাপার নিয়ে তদন্ত কমিটির সঙ্গে বাংলা গভর্ণমেণ্টের প্রচুর বাকবিতণ্ডা এবং মতদ্বৈধ হয়। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী বন্দীবাসে অসহায় রাজবন্দীদের উপর পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। ফলে কয়েকজন রাজবন্দী হতাহত হয়। এই ঘটনায় যতীন্দ্রমোহন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ থেকে তাঁর যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগ হয়েছিল, তা আর তাঁকে ছাড়ে নি। তিনি অসুস্থ দেহ নিয়েও দেশসেবা করে চলেছিলেন। হিজলী বন্দীবাসের দুর্ঘটনার সময় তিনি ভীষণ অসুস্থ। তা সত্ত্বেও ডাক্তারদের বারণ না শুনে তিনি কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত

হন এবং তীব্র ভাষায় একটি স্মরণীয় বক্তৃতায় পুলিশের এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এর পরে তাঁর রক্তের চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়ে তিনি ভীষণ যন্ত্রণা পেতে থাকেন। তখন ডাক্তাররা তাঁকে শীতপ্রধান দেশে—ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কিছুকালের জন্তে বাস করার উপদেশ দেন। ১৯৩১-এর অক্টোবর মাসে যতীন্দ্রমোহন দ্বিতীয়বার সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ড যান। মহাত্মা গান্ধী তখন দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক উপলক্ষে বিলাতে। গান্ধীজীর সাহচর্যে যতীন্দ্রমোহন প্রচুর আনন্দ পান।

গোল টেবিল বৈঠক শেষ করে গান্ধীজী ভারতে ফিরে দেখেন যে সরকারপক্ষ থেকে গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। অনেক খ্যাত-নামা কংগ্রেসকর্মীকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতারা গ্রেপ্তার হন। আবার আইন অমান্ত আন্দোলন সুরু হয়। বিলাতে যতীন্দ্রমোহনের কানে একথা যাওয়ায় তাঁর পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর স্বাস্থ্য তখনও যথেষ্ট ভাল হয় নি। এই অবস্থায় তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বোম্বাইয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করতে না করতেই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সেখান থেকে তাঁকে দার্জিলিং-এ স্থানান্তরিত করা হয়। দার্জিলিং-এ তাঁর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়ে। তখন শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তিনি জলপাইগুড়ী জেলে স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি এক বছরের অধিককাল কারারুদ্ধ ছিলেন। পরে এখানেও তাঁর স্বাস্থ্য এত বেশী খারাপ হয়ে পড়ে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাঁকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হবে বলে স্থির হয়। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা এই অধিবেশনের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। স্বামীর সানন্দ সমর্থনে তিনি এই সম্মানের পদ গ্রহণে স্বীকৃতা হন।

কিন্তু সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজালের ফলে যথারীতি এই অধিবেশন করা সম্ভব হয় নি। তবু শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা নির্ধারিত দিনে ছোট একটি জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে হইয়া এই কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ২।৩ দিন পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইত্যবসরে যতীন্দ্রমোহনের রক্তের চাপ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে রাঁচীতে শৈলাবাসে অন্তরীণ রাখার সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে তাঁর সঙ্গে বাস করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৩৩এর ৫ই জুন তাঁরা রাঁচী যান। এখানেও তাঁর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রাঁচীতে এক মাসের অধিককাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে ২২শে জুলাই রাত্রে এই বীর বাঙ্গালী নেতা স্বদেশ স্বজন থেকে দূরে প্রবাসে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই দুঃসংবাদে সমগ্র বাংলাদেশ শোকে সমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। ২৪শে জুলাই যতীন্দ্রমোহনের মৃতদেহ কলিকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং বিরাট শোভাযাত্রা করে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকের ধারণা যে যতীন্দ্রমোহনের শব-শোভাযাত্রা যত বড় হয়েছিল, স্বয়ং দেশবন্ধুর শব-শোভা যাত্রাও তত :বড় হয়নি। মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে বাংলার বীরসন্তান দেশপ্রিয়ের মৃত্যুতে বাংলার যে ক্ষতি হল, আজও তার পরিপূরণ হয় নি।

তাঁর জীবন ও চরিত্র ছিল পূর্ণাঙ্গ। দেশ-সেবা তাঁর জীবনের ব্রত হলেও, তিনি ছোট বেলা থেকে খেলা-ধূলোর বড় সমর্থক ছিলেন। পরিণত বয়সেও টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে তিনি টেনিস খেলতেন। ভারতের আর কোন নেতার চরিত্রে এগুণটি দেখা যায় না। শত কাজের ফাঁকেও খেলার মাঠে না গেলে তাঁর যেন তৃপ্তি হ'ত না। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ

টেনিস ক্লাব সাউথক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য বহু ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলার ক্রীড়াজগতও প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মৌলানা আবুলকালাম আজাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পুরাণো দল এবং নতুন দলের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনি সেতু-স্বরূপ। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভারতীয় কংগ্রেসের জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতারা যেমন মৌলানা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করেন না, তেমনই স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও প্রতি পদক্ষেপে মৌলানা আজাদের উপদেশ গ্রহণ করেন। মৌলানা সাহেবের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর জ্ঞানের বিশাল পরিধিই এই প্রভাবের কারণ। বস্তুত মৌলানা সাহেবের ইসলামী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আধুনিক জগতে দুর্লভ। তাঁকে দেখলে প্রাচীন যুগের দিল্লীর বাদশাহদের দরবারের সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা মনে পড়ে যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। শুধু যে ভারতের জাতীয় জীবনের উপরই তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন তা নয়—তাঁর লেখনী ভারতের বাইরে অনেক দেশেই তাঁর প্রভাব বিস্তারের সহায়তা করেছে। আফ্‌গানিস্থান, সুদূর মধ্য প্রাচ্য এবং মিশরে তাঁর আরবী রচনাবলীর অপরিসীম প্রভাব। জগতের যেখানেই আরবী এবং পারশী

ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং কথা বলা হয়, সেখানেই মৌলানা সাহেবের নাম সুপরিচিত এবং সম্মানিত।

তাঁর খ্যাতিটা যেমন আন্তর্জাতিক, তাঁর ব্যক্তিত্বও তেমনই আন্তর্জাতিক। মূলত মৌলানা আজাদ ভারতীয় হলেও, তাঁর জন্ম হয়েছিল সুদূর আরবদেশে ইসলামের তীর্থ স্থান মক্কা নগরীতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা বড় এবং প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রোর সুবিখ্যাত আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাল্য বয়সে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি আরবী ও পার্শী ভাষায় অপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং ইসলামী ধর্ম শাস্ত্র ও দর্শনে তিনি এত পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিলেন যে সবাই তাঁকে শিশু-প্রতিভা বলে মনে করত। তাঁর পিতা নিজেও একজন সুপরিচিত এবং সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ধর্মগুরুও ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত ত্যাগ করে তিনি মধ্য প্রাচ্যের ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক, মিশর, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এই সব দেশের সর্বত্রই তাঁর প্রচুর শিষ্য ছিল। পরে মৌলানা আজাদকে নিয়ে তিনি এসে ভারতে বসবাস সুরু করে দিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন সবাই আশা করেছিল যে তাঁর প্রতিভাশালী পুত্রও হয়ত পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মগুরুর ব্যবসা অবলম্বন করবেন। ধর্মগুরুর ব্যবসায় অবলম্বন করলে মৌলানা আজাদ আজ মাননীয় আগা খাঁর চেয়ে কোন অংশে কম প্রভাবশালী ধর্মগুরু হতেন না।

মৌলানা আজাদ কিন্তু ধর্মগুরু হলেন না: আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠ করে তাঁর মনে বিপ্লবের বীজ উপ্ত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ

ভ্রমণের ফলে তাঁর চরিত্রে ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামীর স্থান ছিল না। এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই : মৌলানা আজাদ প্রথম থেকে বাংলাকেই তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাসস্থান এবং কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতায়। তিনি স্থির করলেন যে ধর্মগুরু না সেজে তিনি ঘুমন্ত মুসলিম জনগণের মনে এনে দেবেন স্বাধীনতার স্বপ্ন—তাদের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দেবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "আল হিলাল" নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং নিজে "আজাদ" এই ছদ্ম নামে সেই পত্রিকায় লিখতেন। অল্প দিনেই এই পত্রিকাখানির প্রচার ও প্রসার অসম্ভব বেড়ে গেল—চতুর্দিকে হৈচৈ স্থুরু হয়ে গেল। তাঁর অগ্নিময় বাণী দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের সংবাদিকতার ইতিহাসে সে এক অভিনব ব্যাপার। "আল হিলাল" নিয়ে চারদিকে সমালোচনার হিড়িক পড়ে গেল। তরুণ মুসলমান সমাজ "আল হিলালের" নির্ভীক সমালোচনা ও যুক্তিসঙ্গত রচনা পাঠ করে খুসীই হত। কিন্তু পত্রিকাটির বৈপ্লবিক স্থরে চটে গেলেন প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মুসলমানরা। তরুণ সম্পাদকের প্রাণনাশের ভীতিপ্রদর্শনও করা হয়েছিল। কিন্তু আবুলকালাম দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর কাজ সমানে চালাতে লাগলেন। ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে "আল হিলালের" মত অল্প সময়ে এত প্রভাব আর কোন পত্রিকা বিস্তার করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। "আজাদের" শক্তিশালী আক্রমণের ফলও ফলল। "আল হিলালের" তীব্র সমালোচনার ফলে মুসলিম লীগের চোখ খুলল। মুসলিম লীগের পরিচালকরা এতদিন পর্যন্ত মুসলমান জনসাধারণকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে গভর্নমেণ্টের স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট করে রাখার চেষ্টায় ছিলেন। "আল হিলালের" তীব্র কশাঘাতে সজাগ হয়ে তাঁরা মুসলিম-লীগকে রাজনীতি-সচেতন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সচেষ্ট হলেন।

পত্রিকাটির অভূতপূর্ব সাফল্যে গভর্ণমেণ্টও শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তাঁরা পত্রিকাটিকে দমন করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাঁদের সে সুযোগ এল। একমাত্র "আল হিলালেই" মৌলানা আজাদ গভর্ণমেণ্টের নীতি ও কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা কর্‌ছিলেন। এলাহাবাদের "পায়োনিয়া"র পত্রিকাটি ছিল তখন সরকারী নীতির বড় সমর্থক। এই পত্রিকাটি "আল হিলালে"র তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। শীঘ্রই বিলাতের পার্লামেণ্ট পর্যন্ত নড়ে উঠ্‌ল। পার্লামেণ্টে "আল হিলাল" নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সুযোগ বুঝে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধান প্রয়োগ করলেন। "আল হিলালে"র জামানৎ বাজেয়াপ্ত করে গভর্ণমেণ্ট জামানৎস্বরূপ আরও দশ হাজার টাকা দাবী করলেন। "আল হিলালে"র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আবুলকালাম আজাদ অত সহজে পরাজিত হবার লোক ছিলেন না। তিনি "আল বালাঘ্‌" নামে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এরও নীতি হল সরকারী কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এ অপমান হজম করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাইতে মৌলানা আজাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করা হল। অবশেষে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র বাংলাতেও তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। এত করেও গভর্ণমেণ্ট নিরস্ত হলেন না। তাঁকে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রাঁচীতে অন্তরীণ করা হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিপ্লবী কার্যকলাপের অভিযোগ আনীত হল। এর ফলে তিনি আরও বেশী প্রভাবশালী এবং শক্তিমান হয়ে উঠলেন। তিনি ভারতের মুসলমান জনমতে যে নতুন ভাবধারা এনে দিয়েছিলেন শীঘ্রই তার ফল ফলল। তাঁকে অন্তরীণ করার কয়েক মাস পরেই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম

লীগের মধ্যে একটা বোঝাপাড়া হল এবং লক্ষ্ণৌতে সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত হল।

প্রায় চার বছর অন্তরীণ থাকার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মৌলানা সাহেব মুক্তি পেলেন। তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে কংগ্রেসের অসহযোগ এবং খিলাফৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর যোগদানে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রচুর শক্তি বৃদ্ধি হল। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অভ্যর্থনার বিরোধিতা করে সারা ভারতে যে বয়কট আন্দোলন হয়েছিল তাতে মৌলানা সাহেব উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আবার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ধরা পড়ে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সেই থেকে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শকে কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তাঁর কারামুক্তির পরে পরেই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। অনেকের ধারণা আছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কম বয়সে ভারতের কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু সে ধারণা সত্য নয়। মৌলানা আবুলকালাম আজাদই সর্বাপেক্ষা কম বয়সে কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি যখন প্রথম সভাপতি হন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। আর জওহরলাল যখন সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বৎসর। মৌলানা সাহেবের আগে কিংবা পরে এত কম বয়সে আর কেউ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন নি। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত আবুলকালাম আজাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। ১৯৩০

খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি অস্থায়ীভাবে কিছুদিন সভাপতির কাজ করেছিলেন। তারপর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে তিনি পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। আজ পর্যন্ত কারারুদ্ধ মৌলানা আজাদই জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট প্রস্তাবের ফলে তিনি অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ধৃত হয়ে আহমদনগর ফোর্টে কারারুদ্ধ আছেন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই কলিকাতায় তাঁর পত্নী-বিয়োগ হয়। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা প্রিয়তমা পত্নীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিতির সুযোগও মৌলানা সাহেবকে দেওয়া হয়নি। জীবনে এত ত্যাগ স্বীকার এবং যন্ত্রণা সহ্য করেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের স্বাধীনতার আদর্শে মৌলানা আজাদের অবিচলিত নিষ্ঠা বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। গান্ধী-বড়লাট পত্রবিনিময় প্রকাশিত হবার পর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী আহমদনগর ফোর্ট থেকে কংগ্রেস সভাপতি-রূপে মৌলানা আজাদ ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর মনের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা পরিস্ফুট। এখানে আলোচ্য পত্রের অংশবিশেষ উধৃত না করে পারলাম না: "আপনি যখন বিবেচনা করেছেন যে ন্যায়সঙ্গত কারণে হিংসার প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন আপনি নিজেই নানা প্রকারে হিংসা সমর্থন করেছেন। কংগ্রেস কিন্তু মতে এবং কার্যে অহিংসাকেই আঁকড়ে আছে এবং ২৩ বৎসর ধরে এই পদ্ধতিই জনসমাজে প্রচার করেছে।···কংগ্রেস যদি স্বেচ্ছায় হিংসা ও ধ্বংসাত্মক কার্যে প্ররোচনা ও অনুপ্রেরণা দিত তবে ভারতে তার ফল কি হত সে কথা আপনাকে বিবেচনা করে দেখতে বলি—কেননা এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার চেয়ে একশগুণ বেশী খারাপ অবস্থা সৃষ্টি করার মত সর্বব্যাপী প্রভাব কংগ্রেসের আছে।···

"আপনি এই বলে মহাত্মা গান্ধীকে লেখা আপনার চিঠি (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩) শেষ করেছেন যে আজ হোক কাল হোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সম্মুখীন কংগ্রেসকে হতেই হবে। যেদিন আমরা পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তাঁদের হাতেই বিচারের ভার দিতে পারব সেদিনকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাব। সেদিন কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সহ আরও অনেককে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতে হবে। আমার বিশ্বাস যে তারাও সেই দিনটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।"

মৌলানা আজাদ হিন্দুমুসলমানের মিলন-প্রয়াসী এবং তিনি অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী। তিনি কোন ধর্ম বা জাতির স্বার্থ সঙ্কোচের বিরোধী। তবে তাঁর কাছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন আগে। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার জন্যে ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্তনে ইচ্ছুক। মনোবৃত্তি এবং বিশ্বাসের দিক থেকে মৌলানা সাহেব খাঁটি গান্ধীবাদী নন, কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি গান্ধীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রাজনীতিবিদদের মধ্যে তাঁর মতবাদ সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী। তাঁকে ঠিক জননেতা বলা চলে না এবং জননেতা হবার প্রয়াসও তাঁর নেই। জ্ঞানার্জন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন এবং তিনি নির্জন পাঠাগারে বসে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো করতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তিনি যেমন শক্তিশালী লেখক, তেমনই শক্তিশালী বক্তা। তাঁর বাগ্মিতার গুণে বিরাট বিরাট জনসভা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। এত গুণাবলী সত্ত্বেও মৌলানা সাহেবের জননেতা হবার প্রয়াস নেই।

মৌলানা আজাদ নিরহঙ্কার এবং তাঁর উচ্চাকাঙ্খা নেই বললেই চলে। তিনি যেন নিছক স্বভাব বশতই রাজনীতি করে চলেছেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর যখন মৃত্যু হলো, সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। মৌলানা আজাদ

ইচ্ছা করলেই বাংলার অবিসম্বাদী নেতার আসন গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু কারও কথা তিনি শুনলেন না। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় এলেন তাঁকে বোঝাতে: তাঁকে এক সঙ্গে কলিকাতার মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং আইনসভায় স্বরাজ্যদলের দলপতির পদ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু মৌলানা সাহেব স্বেচ্ছায় এই ত্রিমুকুট প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তখন ইসলামী ধর্মগ্রন্থ কোরাণের একটি নতুন ভাষ্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কোরাণের ভাষ্য প্রকাশের পর সমগ্র মুসলিম জগতে সাড়া পড়ে। এই প্রামাণ্য ভাষ্যখানির বিক্রয়ও অসম্ভব রকম বেশী। মৌলানা আজাদের মত ত্যাগী, নির্লোভ ও নির্ভীক স্বদেশ প্রেমিক বর্তমান ভারতে দুর্লভ।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

তরুণ ভারতের অবিসম্বাদী নেতা বলতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকেই বোঝায়। তিনি কিন্তু বয়সের দিক থেকে একটুও তরুণ নন। বর্তমানে তাঁর বয়েস ৫৫ বৎসর। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে জনসমাজ আজও তাঁকে তরুণ নেতা বলেই জানে। পণ্ডিতজীর সুনিপুন কর্মঠ দেহাকৃতি এবং চিন্তাধারার চির তারুণ্যই বোধ হয় লোকের মনের এ ধারণাকে সঞ্জীবিত করে রাখে। বর্তমানে ভারতে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর পরেই জওহরলালের স্থান। বিদেশেও মহাত্মা গান্ধীর পরেই তাঁর স্থান। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার গান্ধীজীর উপরেও তাঁকে স্থান দেওয়া হয়। স্বদেশে তাঁর জনপ্রিয়তার হেতু দেশের

জন্তে অপূর্ব আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগের দিক থেকে একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। বিদেশে তাঁর প্রসিদ্ধির কারণ তাঁর বহু-বিক্রীত আত্মজীবনী। নিজেকে কেন্দ্র করে তিনি এই আত্মজীবনীর মারফৎ বিদেশবাসীদের নিপীড়িত পরাধীন ভারতের মর্মবাণীই শুনিয়েছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ডে এই বইখানির প্রথম প্রকাশের পর অনেক সংস্করণ নিঃশেষে বিক্রয় হয়ে গেছে। কিছুকাল পূর্বে এই বইখানির একখানি আমেরিকান সংস্করণও প্রকাশিত হয়ে জনসমাজে সমাদর লাভ করেছে। তাঁর বইয়ের মারফৎই পাশ্চাত্যজগৎ সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে ভারতবর্ষকে জানবার সুযোগ পেয়েছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আত্মজীবনীতে বর্ণিত কাহিনীর অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র ত আছেই—তার উপর আছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অপূর্ব লেখনী-নৈপুণ্য। পাশ্চত্যদেশবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় চিন্তা করে, পণ্ডিতজী সেই ভাষায় তাদের ভারতের কথা শুনিয়েছেন; তাই এ বইটির এত সমাদর। পরলোকগত সি, এফ, এণ্ড্রুজের কাছে একজন ইংরেজ আই-সি-এস্ কর্মচারী একবার এ বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: "এ লোকটিকে আমরা বুঝতে পারি। তিনি আমাদেরই একজন এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলেন।" পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে এ কথাটী অনেকটা খাটে বই কি!

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্ম। তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর একমাত্র পুত্র। পিতার ইচ্ছায় তিনি অল্প বয়সেই ইংল্যাণ্ড যান। প্রথমে হ্যারোর পাব্লিক স্কুলে—পরে অক্সফোর্ডে তিনি অধ্যয়ন করেন। সাধারণ শিক্ষা শেষ করে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়েন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং আইন-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে ভারতীয়

রাজনীতিতে পুরোপুরি যোগ দেবার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলালের জীবনে তেমন কিছু বৈশিষ্ট দেখা যায় নি। ছাত্র হিসাবে তিনি গড়ে ভাল এবং বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন—এই পর্যন্ত। কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দেবার পূর্বে তাঁর চরিত্রের সমস্ত গুণগুলো আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি।

জওহরলালের চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ সম্বন্ধে তিনি নিজেও সম্পূর্ণ সজাগ। দেশের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরক্তি আছে, কিন্তু তিনি অন্ধ স্বদেশ-প্রীতির বিরোধী। কাজের প্রতি তাঁর অপূর্ব নিষ্ঠা এবং কোন একটা কাজ হাতে নিলে তা তিনি শেষ না করে ছাড়েন না। অসমাপ্ত কিংবা অর্ধসমাপ্ত কাজ তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না। তাঁর সময়-নিষ্ঠারও তুলনা মেলা ভার। যাঁরা জওহরলাল নেহেরুকে প্রেসিডেণ্টরূপে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন পরিচালনা করতে দেখেছেন, তাঁরাই তাঁর কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর এ কর্ম-পদ্ধতি হ্যারো এবং অক্সফোর্ডের শিক্ষার ফল—সে কথা না বলে উপায় নেই। শুভ্র খদ্দর পরিহিত খাঁটি স্বদেশী জওহরলালের চরিত্রে এই সব গুণের সমাবেশ একটু বিস্ময়কর নয় কি? নিজের সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনীতে জওহরলাল একস্থানে লিখেছেন: "আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ—সর্বত্রই বেমানান, কোথাও যেন আত্মস্থ নই। হয়ত আমার চিন্তাধারা এবং জীবনকে দেখবার ভঙ্গী প্রাচ্যের চেয়ে যাকে পাশ্চাত্য বলা হয় তারই সগোত্র, কিন্তু ভারত তার অন্যান্য সন্তানকে যেমন অসংখ্যরূপে আঁকড়ে ধরে আছে, আমাকেও ঠিক তেমনই আঁকড়ে ধরে আছে। আমার সম্প্রতি-প্রাপ্ত অতীত উত্তরাধিকারের হাত থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি না। এরা উভয়েই আমার অংশ বিশেষ এবং তারা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে—উভয়ত্র আমাকে সাহায্য করে বটে—কিন্তু তারা শুধু সাধারণের কাজেই

নয়—জীবনের ব্যাপারেও আমার মনে একটা আধ্যাত্মিক একাকিত্ব-বোধ জাগিয়ে তোলে। আমি পাশ্চাত্যজগতে নবাগত—বিদেশী। আমি তার অংশবিশেষ হতে পারি না। কিন্তু সময় সময় আমার নিজের দেশেও নিজেকে নির্বাসিতের মত অনুভব করি।" জওহরলালের মনের এই দ্বন্দ্ব অতি স্বাভাবিক এবং বাস্তব।

তাঁর মনে যত দ্বন্দ্বই থাক, জওহরলালের স্বদেশ-প্রেমের সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। ভারতের জাতীয়তার ক্ষেত্রে আজ একমাত্র গান্ধীজীর পরেই তাঁর স্থান। তিনি যে গান্ধীজীর পরম ভক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অন্ধ ভক্ত নন। জওহরলালের মানসিক গঠন এত বেশী বিজ্ঞানবাদী ও যুক্তি-পন্থী যে তাঁর পক্ষে কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অনুভব করা অসম্ভব। তাই তিনি গান্ধীজীর অনেক কিছুরই কঠোর সমালোচনা করেন এবং তাঁর অনেক কাজকেই অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও তিনি জানেন যে ভারতীয় জন-মানসে জাতীয়তার সাড়া জাগানোর যে অপূর্ব শক্তি গান্ধীজীর আছে, সে শক্তি আর কারও নেই। / গান্ধীজী এবং জওহরলালের চরিত্রের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা এবং অসামঞ্জস্য থাকলেও, একটি মৌলিক বিষয়ে উভয়েরই মিল আছে। এঁরা উভয়েই অন্তরে অন্তরে জানেন যে শুধু অপরিসীম আত্মত্যাগ করে এবং দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেই ভারতের মুক্তিসাধন সম্ভব। / জওহরলাল এ সত্য জানেন যে দৈহিক দিক থেকে শীর্ণকায় মহাত্মা গান্ধী অপরিসীম মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। দেশের স্বাধীনতার জন্যে গান্ধীজী নিজের জীবন বিপন্ন করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হন নি এবং ভবিষ্যতেও কোন দিন হবেন বলে মনে হয় না। গান্ধীজীর কাছ থেকে জওহরলাল একটা বড় রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়েচেন—যেটা তাঁর জীবনের গতিকেই দিয়েছে

বদলে। গান্ধীজীর মারফৎ তিনি ভারতীয় জনগণকে চিন্‌তে পেরেছেন—তিনি বুঝতে পেরেছেন যে দেশের নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকেরাই হচ্ছে ভারতের মেরুদণ্ড। ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করতে না পারলে, ভারতীয় কংগ্রেস যে কোন দিন স্বাধীনতা-যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না—এ সত্য গান্ধীজীই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন এবং সর্বপ্রথম তাঁরই মারফৎ কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের প্রকৃত সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কংগ্রেসে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জওহরলাল প্রমুখ নেতাদেরও এই ধারণা ছিল। এমন সময় এলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি তাঁর চরিত্রের চুম্বক প্রভাবে ভারতের সকল প্রদেশের সব নেতাকে একত্রিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে জাতীয় কংগ্রেস যে পথে চলেছে সেটা ভুল। ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন লোক হচ্ছে কৃষিজীবী। প্রকৃত ভারত সহরে নয়—পল্লীতে। শুধু সহরের দিকে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে যদি ভারতের শতকরা ৯০ জন লোককে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তবে কংগ্রেস কোন দিন সর্বব্যাপী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে না—কংগ্রেসের মারফৎ ভারতের স্বাধীনতাও কোন দিন আসবে না। গান্ধীজী নিজে ভারতীয় কৃষকদের মত সহজ সরল জীবন যাপন করে পল্লী ভারতের স্বরূপকে দেশবাসীদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তখন থেকে পল্লীই হল কংগ্রেসের প্রাণ; মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান থেকে কংগ্রেস পরিণত হ'ল বিপ্লবী গণ-প্রতিষ্ঠানে। গান্ধীজীর জীবনের এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

কংগ্রেসের এই স্বরূপ পরিবর্তনের অর্থ কি তা জওহরলাল বুঝতে পেরেছিলেন—বুঝতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজীর আদর্শে কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও

বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং যাদের মুক্তির জন্যে তাঁকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে হবে, তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হ'তে হলে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—তাদের সমান স্তরে পৌঁছতে হলে তাঁকে অনেক ব্যয়বহুল অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। তিনি তাঁর জন্যে প্রস্তুতও ছিলেন। স্বদেশ—সেবার জন্যে আত্মত্যাগ করতে জওহরলালকে কখনও কুণ্ঠিত হতে দেখা যায় নি। কিন্তু গান্ধীজীর মত দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে কোন দিন সম্ভব হয় নি। গান্ধীজীর মধ্যে অশন বসন সম্বন্ধে একটা ঋষি-সুলভ আত্ম-নিপীড়নের ভাব আছে; জওহরলালের মধ্যে কিন্তু সেটা নেই। তিনি মনেপ্রাণে খাঁটি আধুনিক। গান্ধীজীর অনশন, উপবাস প্রভৃতি তাঁকে একটুও মুগ্ধ করে না। তাই তাঁর বিংশ শতাব্দীর মন নিয়ে তিনি গান্ধীজীর অনেক কাজ এবং অভ্যাসকেই মধ্যযুগীয় বলে মনে করেন। দেশের জন্যে গান্ধীজীর স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগের তুলনা হয় না বটে; কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যুগ (১৯২১) থেকে আজ পর্যন্ত জওহরলালের স্বার্থত্যাগের হিসাব যদি করা যায়, তবে দেখা যাবে যে গান্ধীজীর সঙ্গে তুলনায় তাঁর স্বার্থত্যাগের পরিমাণও খুব কম নয়।

দেশবাসীরা তাঁর আত্মত্যাগের সংবাদ জানে বলেই তাঁকে এত ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। তাঁর নিজের দেশ যুক্ত প্রদেশে জওহরলাল মুকুটহীন রাজা বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যুক্ত প্রদেশের দরিদ্র চাষীরা তাঁকে প্রায় দেবতার মত ভক্তি করে। বিলাত থেকে ফেরার পর তাঁর স্বদেশবাসী কৃষকরা তাঁকে জানবার অবকাশ পায় নি। তিনি তখন সহরের নানাপ্রকার জনহিতকর কার্যসাধন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি গান্ধীজীর আদর্শকেই জীবনের ব্রত করে নিলেন, সেদিন থেকেই তারা তাঁকে জানবার অবকাশ পেল। দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস, জওহরলাল নিরক্ষর দরিদ্র পল্লীবাসীদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের সঙ্গে একত্র বাস করেছেন। এমনই ভাবে তিনি তাদের জীবনের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন এবং তাদের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর একটি অঙ্গুলি হেলনে তারা হেলায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে—তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস এত গভীর। আত্মজীবনীতে পণ্ডিতজী এদের সম্বন্ধে লিখেছেন: "এই সেই জনগণ—তারা প্রীতিপূর্ণ উজ্জ্বল চোখে তাকায়, তাদের পিছনে বহুযুগ সঞ্চিত দারিদ্র আর যন্ত্রণা—তবু তারা প্রেম আর কৃতজ্ঞতা ঢেলে দেয় এবং প্রতিদানে শুধু ভ্রাতৃপ্রীতি ও সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু চায় না। এই প্রেম ও ভক্তির প্রাচুর্যে নিজেকে বিনীত এবং বিস্মিত না ভেবে উপায় থাকে না।" প্রধানত জওহরলালের ব্যক্তিগত নেতৃত্ব এবং তাঁর সহকর্মিদের একনিষ্ঠার ফলে যুক্তপ্রদেশের কিষাণ আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মত ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও বিহারে চাষীদের একান্ত বিশ্বাসভাজন। তাই একমাত্র বিহারের সঙ্গেই যুক্তপ্রদেশের কিষাণ আন্দোলনের তুলনা চালতে পারে।

কৃষি-প্রধান ভারতের নেতৃত্ব করার যোগ্যতম ব্যক্তি যে গান্ধীজী সে বিষয়ে জওহরলালের মনে কণা মাত্র সন্দেহ নেই। ভারতের দরিদ্রতম কৃষকের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করে ফেলাকেই গান্ধীজী গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা বলে মনে করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে এ বিষয়ে খুঁটিনাটি ব্যাপারে পণ্ডিতজীর মতভেদ থাকলেও, মূলনীতি দুজনেরই এক। এ সম্বন্ধে জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন, তার কিছুটা উধৃত করছি: "গান্ধীজী প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী হন আর নাই হন, তি ন ভারতের কৃষকদের প্রতিনিধি; এই কোটি কোটি নরনারীর সচেতন ও অচেতন মনের ইচ্ছার সারাংশ দিয়েই তিনি গঠিত। এটা হয়ত

প্রতিনিধিত্বেরও উর্ধ্বে অন্য কিছু; তিনি অগণিত জনগণের আদর্শ প্রতিমূর্তি।" গান্ধীজীর সম্বন্ধে আর কেউ এত সুন্দর বর্ণনা দিতে পারেন নি। গান্ধীজী এবং জওহরলাল—উভয়েই ভারতের জনগণের মুক্তি-প্রয়াসী এবং মঙ্গলকামী। কিন্তু প্রত্যেকের পথ আলাদা। গান্ধীজী পরিকল্পিত স্বাধীন ভারতে রাজা মহারাজা, জমিদার, মহাজন, মিলমালিকের স্থান আছে। গান্ধীজীর বিশ্বাস যে তাদের মনে যদি অহিংসার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে তাদের হাতে অর্থনৈতিক শক্তি থাকলেও তারা জনগণকে শোষণ না করে তাদের প্রতি সুবিচারই করবে। অহিংসার দ্বারা অত্যাচারী, ক্ষমতা-লোভীর হৃদয়ে পরিবর্তন আনা যায়—এ কথা গান্ধীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত জওহরলাল এই ব্যক্তিগত হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন না। ক্ষমতার অত্যাচার ধনতন্ত্রের মারফৎই আসুক আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মারফৎই আসুক, জওহরলাল একে অনিষ্টকারী বলে মনে করেন। তিনি চান যে দেশের জমি, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সমবায়ী পদ্ধতিতে দেশবাসী মাত্রেরই মালিকানা স্বত্ব থাকবে; তবে ধনবণ্টণ অনেকটা সাম্যের পথ ধরে চলবে। জওহরলালের এ বিশ্বাস সমাজ-তন্ত্র-বোধের থেকে এসেছে। এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর ফলেই পণ্ডিতজী গান্ধীজীর থেকে ভিন্ন।

জওহরলালের জীবনের আর একটি বড় কীর্তি তিনি ভারতীয় কংগ্রেসকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছেন। গান্ধীজী যেমন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসকে জনগণের সংযোগে এনে তাকে বিরাট গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন, পণ্ডিতজীও তেমনি বিদেশে কংগ্রেস আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তাঁকে যদি ভারতীয় কংগ্রেসের বৈদেশিক রাজদূত উপাধি দেওয়া যায়, তবে সেটা অন্যায় হবে না। আজ

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও চীনে কংগ্রেসের সমর্থক-সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এসবেরই মূলে পণ্ডিতজী। গণতন্ত্রের প্রতি জওহরলালের অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই তাঁকে গৃহ-বিবাদে রত স্পেন ভ্রমণে প্রবৃত্ত করেছিল। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্ট সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত স্পেনের গণশক্তির প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হবার পরও যখন ব্রিটেন ও আমেরিকা চীনের স্বাধীনতারক্ষায় সাহায্য করে নি— তখন পণ্ডিতজীর দৃষ্টিই পড়েছিল চীনের উপর সর্বাগ্রে। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে চীনকে সাহায্যের জন্যে ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক দল ডাক্তারকে চীনে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে জওহরলাল নিজেও চীন পরিদর্শন করতে গেছিলেন এবং চীনের অধিনায়ক মার্শাল চিয়াং-কাইশেক ও তাঁর পত্নী মাদাম চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে জওহরলালের সুগভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মার্শাল ও মাদাম চিয়াংকাইশেক যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তাঁরা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এই মর্মে তাঁরা একটি ঘোষণাবাণীও দিয়ে-ছিলেন। এ ছাড়াও জওহরলাল সমগ্র ইউরোপ এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচুর ভ্রমণ করেছেন ঃ(সর্বত্র গণনেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ছিল তাঁর ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য।)

জওহরলালের মত একনিষ্ঠ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী খুব কম দেখা যায়। স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে তিনি নিজের পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গেও মতানৈক্য সৃষ্টি করতে পশ্চাৎপদ হন নি। পণ্ডিত মতিলাল ভারতবর্ষের জন্যে মোটামুটি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার পেলেই সন্তুষ্ট হতেন। জওহরলালের মত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ঃ তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের জন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে কংগ্রেসের ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে সর্ব প্রথম পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পণ্ডিতজীর মনে স্বাধীনতা লাভের জন্যে যে অত্যুগ্র পিপাসা আছে তারই জ্বালা তাঁকে বহুবার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তাঁর জীবনে এরূপ ঘটনা একাধিকবার দেখা গেছে যে কারামুক্তির পরে পরেই তিনি এমন কোন বক্তৃতা দিয়ে বসেন কিংবা কাজ করেন যার ফলে তাঁকে পুনরায় কারাগারে যেতে হয়। এ তাঁর প্রকৃতিগত: স্বাধীনতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি আমরণ কারাবরণ করতে রাজী আছেন। একবারের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বিহার ভূমিকম্পের সময়ের ঘটনা। আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে কারারুদ্ধ জওহরলাল সবে মুক্তি পেয়েছেন। মুক্তি পাবার পরেই তিনি কলকাতায় একটি তেজস্বী গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী বক্তৃতা দিলেন। এর পরেই তিনি এলেন বিহারের ভূমিকম্পে অতি ক্লিষ্ট জনগণের দুঃখ-লাঘব করতে। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে তিনি যথাসাধ্য জনগণের সাহায্য করে ফিরে এলেন স্বগৃহে—এলাহাবাদে। এর পরের ঘটনা জওহরলাল নিজেই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন: “ভ্রমণ-শেষে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে আমি ফিরে এলাম। দশ দিনের পরিশ্রমে আমার অবস্থা হয়েছিল মৃতপ্রায় এবং আমার আত্মীয় স্বজন আমার চেহারা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছিলেন। আমি বিবরণী লিখতে সুরু করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কাজেই পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের অন্তত বারো ঘণ্টা আমি ঘুমেই কাটালাম। পরদিন কমলা আর আমি সবে মাত্র চা পান শেষ করেছি—এমন সময় একটি গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং তার থেকে নামলেন একজন পুলিশ অফিসার। আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে আমার সময় এসেছে।” এরকম কারাবরণ তাঁকে বহুবার করতে হয়েছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে

রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার অভিযোগে তাঁকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ যে নতুন ভারত শাসনের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আসেন, জওহরলাল কংগ্রেসের তরফ থেকে সে প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ক্রিপ্স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এর পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভের জন্যে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তার ফলে ৯ই আগষ্ট অন্যান্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলালও কারারুদ্ধ হন। আজ পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধই আছেন। পণ্ডিতজীর মত একজন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী নেতাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ করে রাখায় শুধু ভারত নয়—সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তবু পণ্ডিতজীকে কারামুক্ত করেন নি।

দেশের জন্যে জওহরলাল যে অপূর্ব আত্মত্যাগ করেছেন তার দ্বারাই তিনি দেশবাসীদের হৃদয় জয় করেছেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি যেখানেই যান, সেখানেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে—তাঁকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত করে। তরুণ ভারত তাঁরই আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা পায়। এই বয়সে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তিনবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি বরাবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য আছেন। মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে সকল কংগ্রেস নেতাই জওহরলালের সুবিবেচিত

মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। জওহরলাল মূলত পরাধীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা হলেও, তাঁর আর একটা দিকও আছে। রাজনীতির বিচার করতে গিয়ে তাঁর এ দিকটি উপেক্ষা করা চলে না। তিনি চিন্তাশীল মনীষী ও সুলেখক। সব রাজনৈতিক নেতার মধ্যেই এ গুণটি পাওয়া যায় না। কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনের একটি মুহূর্তও জওহরলাল আলস্যে কাটান না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও যেমন আছে, তেমনই জগতের আধুনিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় বিস্ময়কর। ইতিপূর্বে তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর একখানি বিরাট গ্রন্থ আছে। এই দুখানি বিরাট বই ছাড়া আরও বহু গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর বইগুলো পড়ে জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। কোটি কোটি নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতবাসীর ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও সমর্থনে ভারতের এই বীর সন্তানের জয়যাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনাই করি।

সীমান্ত গান্ধী

সাধারণের কাছে সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খাঁ আব্দুল গফুর খাঁর কথা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি সৌম্য শান্ত গুম্ফ-শ্মশ্রু-সমন্বিত সরল সুন্দর মুখের চেহারা। তাঁর মত দীর্ঘকায়

ব্যক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না: তাঁর দেহের দৈর্ঘ সোয়া ছয় ফুটেরও উপরে। একসময় তাঁর দীর্ঘাকৃতির অনুরূপ দেহের ওজনও ছিল যথেষ্ট—প্রায় আড়াই মণ। ক্রমাগত কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে তাঁর ওজন বর্তমানে মণ দুয়েকেরও নীচে নেমেছে। তাঁর সমগ্র দেহের উপরে দেশের জন্যে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করার সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যে একটি ছোট প্রদেশ আছে। এই প্রদেশটির নাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই পাঠান জাতীয় মুসলমান। সাধারণত পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী বলে এরা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিংস্রতা ও দস্যুতায় পারদর্শী। এই প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের কাজ হল দস্যুসুলভ লুণ্ঠন কার্য করে জীবিকা নির্বাহ করা। এই সব উপজাতির অত্যাচারে ভারত গভর্ণমেণ্টেকে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। এই প্রদেশেরই পেশোয়ার জেলার উত্তমনজাই নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পাঠান বংশে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে খাঁ আব্দুল গফুর খাঁর জন্ম। বয়সের দিক থেকে তিনি পণ্ডিত জওহরলালের চেয়েও দু বছরের ছোট। গ্রামটি ছোট হলেও তাঁর পরিবারটি ছিল অভিজাত। গফুর খাঁর পিতা ছিলেন উত্তমনজাই গ্রামের সর্দার। গফুর খাঁর নামের প্রথম খাঁ-টি হচ্ছে এই আভিজাত্যের চিহ্ন। তাঁরই মত তাঁর ছোট ভাই ডাঃ খাঁ সাহেবও সীমান্ত প্রদেশের অন্যতম কংগ্রেস নেতা। দাদার মত তিনিও বহুবার কারা যন্ত্রণা-ভোগ করেছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ডাঃ খাঁ সাহেব সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পূর্বেই গফুর খাঁর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের কথা উল্লেখ করেছি। কৈশোর এবং যৌবনে তিনি নিজের সুগঠিত দেহের জন্যে খুব গর্ব অনুভব করতেন—এমন কি এই দেহের দৌলতে তিনি একদিন ভারতীয় সেনাবিভাগে যোগ দিতে পারবেন—এ স্বপ্নও মাঝে মাঝে দেখতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর সে স্বপ্ন ভাঙল। তিনি দেখলেন যে সৈন্যদলের ইউরোপীয় কর্মচারীরা তাঁদের ভারতীয় সহকর্মীদের প্রতি রীতিমত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন—তাঁদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না বলা চলে। তখন তিনি তাঁর মত বদলালেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের গতিও গেল ঘুরে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর সেনাবিভাগে কমিশন পাবার সুযোগ এল, তিনি ঘৃণায় সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর পিছনে আর একটি কারণও ছিল। তিনি ছোট বয়েস থেকেই মৌলানা আবুলকালাম আজাদের বিপ্লবী লেখার সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকটা বিপ্লবী হয়ে উঠছিল। আব্দুল গফুর খাঁ তখনও আলিগড়ের ছাত্র। সেই সময় মৌলানা আজাদ কলিকাতা থেকে তাঁর 'আল হিলাল' নামক উর্দু পত্রিকা বের করছেন। রাজনৈতিক রচনায় মৌলানা আজাদের অপূর্ব দক্ষতা ছিল—তাঁর লেখনী দিয়ে আগুণ ছুটত বলা চলে। আলিগড়ে যখন গফুর খাঁ ছাত্র, তখন থেকেই তিনি 'আল হিলালে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন। 'আল হিলাল' তাঁর চোখের সামনে যেন নতুন জগৎ খুলে দিল। মৌলানা আজাদ তাঁর চমৎকার তেজস্বী গদ্য রচনার মারফৎ নিজের সম্প্রদায়ের ভ্রাতা ভগ্নীদের মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর নব জাগরণের বাণী শোনাতেন—তীব্র ভাষায় মুসলিম লীগ ও লীগ-নেতাদের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন। আবদুল গফুর খাঁ আলিগড় থেকে নিজের প্রদেশে এই নব জাগরণের বাণীই বয়ে নিয়ে এলেন।

স্কুল কলেজের শিক্ষা তাঁর বেশী নয়—তিনি মাত্র এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছেন।

সীমান্ত প্রদেশে ফিরেই গফুর খাঁ জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজের প্রদেশ ও নিজের জাতিকে গড়ে তোলার কাজে লেগে গেলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর দেশ সেবার কাজ আরম্ভ বলা চলে। তিনি নিজের গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করলেন; কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট থেকে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হল। এর পরেই এল সারা ভারতব্যাপী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন। তিনিও সীমান্ত প্রদেশে এই আন্দোলন সুরু করলেন। এত অল্প বয়সেও তাঁর শক্তি ও প্রভাব এত বেশী ছিল যে হাজারে হাজারে লোক তাঁর সভায় জমায়েৎ হত। এমনই একটি সভায় আবদুল গফুর খাঁর ৯০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাও উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে তাঁর পিতার সামনেই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এবং তাঁকে বিনা বিচারে আটক রাখা হল। আটক থাকার সময় পুলিশের বড় কর্তার কাছ থেকে একটি প্রতিনিধিদল গেল তাঁকে বুঝিয়ে আপত্তিকর কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে। আব্দুল গফুর খাঁর পিতামহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশ পক্ষে লড়েছিলেন—তাই তাঁকে আইন-বিরোধী কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে পুলিশের বড় কর্তার এত আগ্রহ। কিন্তু তরুণ গফুর খাঁ একটুও নড়লেন না। বিপ্লবী পুত্রের প্রভাবে পড়ে বৃদ্ধ পিতাও শেষ বয়সে রাজভক্ত প্রজা থেকে সরকার-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁর পিতাও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন।

কারাজীবনে গফুর খাঁর অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হল। তাঁকে অনবরত শিকল পরিয়ে রাখা হত। অথচ সাধারণ কয়েদীদের এই

শিকল তাঁর পক্ষে অত্যন্ত ছোট হ'ত বলে তিনি খুব কষ্ট পেতেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই আনন্দে কাটাতেন এবং তাঁর চারপাশের সকলের জীবনেই নিজের মতবাদের প্রভাব ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। কারাগারেই তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার সুরু করেছিলেন এবং তিনি রীতিমত ক্লাস খুলে গীতা ও কোরাণের প্রধান প্রধান ভাবধারা সম্বন্ধে নিজেই শিক্ষা দিতেন। যখন তাঁর কারামুক্তি হল, তখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। পূর্ণোদ্যমে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন চলছে। মুক্তি পেয়ে গফুর খাঁ উভয় আন্দোলনেই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যেই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি প্রচুর আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ তুরংজাইয়ের হাজী সাহেবের সহায়তায় তিনি সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে আর কোন নেতার প্রচেষ্টায় এরূপ জাতীয় শিক্ষা বিধানের ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা সন্দেহ। হাজী সাহেব পরে ব্রিটিশ নীতির চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উঠিয়েছিলেন এবং বহু রাত্রি জেগে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিকল্পনা করতেন। আব্দুল গফুর খাঁ ও হাজী সাহেবের পথ ক্রমেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল।

১৯৩০এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সীমান্ত প্রদেশের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হল। খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় একনিষ্ঠার সঙ্গে বহুদিন ধরে যে স্বদেশ-সেবা করে আসছিলেন তার ফল দেখা গেল: সমগ্র প্রদেশের জনগণ তাঁদের নির্দেশে কারাবরণ করতে প্রবৃত্ত হল। কারাগারে স্থান সঙ্কুলান হয় না—অথচ হাজার হাজার নরনারী জেলে যেতে প্রস্তুত। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াল; তাঁরা দেখলেন যে সামরিক দিক থেকে একটি মূল্যবান প্রদেশ তাঁদের

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর ফলে সুরু হল নির্যাতন—নিপীড়ন। এই নিপীড়নের কাহিনী বিঠলভাই প্যাটেলের পেশোয়ার অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এর পরে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় মুক্তি পেলেন। এর কয়েক মাস পরে আবার তাঁরা কারারুদ্ধ হলেন। গান্ধীজী বিলাতের গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আসার আগেই সীমান্ত অর্ডিনান্স জারী করে খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি—অথচ বলা হচ্ছিল যে খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় তুরংজাইয়ের হাজী সাহেবের সহায়তায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করছিলেন। এ অভিযোগ যে কত মিথ্যা তা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় নি; সীমান্তের পাঠানেরা সম্পূর্ণ অহিংসভাবে যে আইন অমান্য আন্দোলন চালাচ্ছিল, সেই অপূর্ব দৃশ্যই এ অভিযোগ খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে যে কর্ম-প্রেরণা ও উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। আব্দুল গফুর খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর ভ্রাতা ভগ্নী, পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সবাই কারাবরণ করেছিলেন।

আব্দুল গফুর খাঁ সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের অনুগামী। অহিংসা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতভেদ হয়। ৩০শে ডিসেম্বর বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এই মতভেদের দরুণ গান্ধীজীকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনার মাস খানেক পরে ১৯৪২এর ফেব্রুয়ারী মাসে খাঁ আব্দুল গফুর খাঁও গান্ধীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওয়ার্কিং

কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধার অন্ত নেই। মহাত্মাজীর সুবিপুল ত্যাগের আদর্শে তাঁর সমগ্র জীবন গঠিত। দুই দুই বার তাঁকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হতে অনুরোধ করা হয়েছিল। দুই বারই তিনি এই অজুহাতে সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেন যে এত বড় পদে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা তাঁর নেই। যোগ্যতা তাঁর পুরো মাত্রাতেই আছে—শুধু তিনি নেতৃত্ব লাভের প্রয়াসী নন। তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে জন-সেবা ও জন-কল্যাণ করতে ভালবাসেন। অভিজাত ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম; বাল্য ও কৈশোর তাঁর বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্য দিয়েই কেটেছে। অথচ বর্তমানে তিনি প্রায় ফকিরের মত জীবন যাপন করছেন বলা চলে। এমন কি এক সময় তিনি যে চা খেতে খুব ভালবাসতেন, সেই চাও তিনি ত্যাগ করেছেন। আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি দরদের দিক থেকে তাঁর জীবন পুরোপুরি গান্ধীজীর আদর্শে গঠিত বলে, সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি "সীমান্ত গান্ধী" বলে সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক বিনয় এত বেশী যে তিনি নিজে এ নামটি পছন্দ করেন না। তিনি মনে করেন যে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ক্ষুদ্র আত্মত্যাগের কোনই তুলনা হয় না। গান্ধীজীর আদর্শে তাঁর জীবন অনুপ্রাণিত হলেও তিনি কিন্তু মহাত্মাজীর অনুকারী নন। তিনি কোরাণ ও অন্যান্য ইসলামী ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে অহিংসায় বিশ্বাস এবং সর্বব্যাপী প্রেমের নীতি অর্জন করেছেন। এ সব সম্বন্ধে তিনি এবং গান্ধীজী সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে একই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি গান্ধীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক।

ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস সত্ত্বেও গফুর খাঁ বিপ্লবী। তিনি ভারতের স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক এবং জনগণের কল্যাণ সাধন তাঁর জীবনের

অন্যতম ব্রত। ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস তিনি পেয়েছেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। তাঁর পিতা উদার মতাবলম্বী হয়েও ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। গফুর খাঁ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সব ধর্মই সমান—তাই তাঁর মনে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির স্থান নেই। ধর্মের সার বস্তুকেই তিনি আঁকড়ে ধরেছেন ঃ পর ধর্মের প্রতি তাঁর উদারতা ও সহনশীলতা সর্বজন-বিদিত। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আজ তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছেন। বিগত কয়েক বৎসর ধরে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আছেন। তাঁর ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেবের সহযোগিতায় তিনি সীমান্ত প্রদেশের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান প্রধান প্রদেশে দৃঢ় ভিত্তিতে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গড়ে তুলেছেন। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। নিজের স্বার্থত্যাগ এবং মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনি সমগ্র প্রদেশটিকে জাতীয়তা-বোধে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন। সর্বোপরি তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে বিরাট মুসলমান জনগণের সমর্থন এনে দিয়েছেন। ভারতের আর কোন মুসলমান-প্রধান প্রদেশে কংগ্রেসের এত প্রভাব নেই।

তাঁর গণ-সংগঠনী শক্তি অপূর্ব। তিনি পাঠানদের মত দুর্ধর্ষ হিংসাপ্রিয় জাতিকে সাফল্যের সঙ্গে সৎপথে টেনে এনেছেন এবং তাদের নবজীবনের বাণী শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন। সীমান্ত প্রদেশে তিনি যে বিরাট এবং শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছেন, তাতে গভর্ণমেণ্টের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল এবং তাঁরা নানা ভাবে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ভেঙে দিতে পারেন নি। প্রচার-কার্যের সুবিধার জন্যে গভর্ণমেণ্ট এদের নাম দিয়েছেন "লাল কোর্তার" দল (Red Shirts)। এতে স্বভাবতই লোকের মনে সন্দেহ হবে যে "লাল

কোর্তারা” হয়ত বিপ্লবী সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত। কার্যত কিন্তু তা নয়। এদের কোর্তার রঙই শুধু লাল—ভাবধারায় লাল রঙের স্পর্শ মাত্র নেই। সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে জন-সেবা ও জন-কল্যাণ করাই এদের জীবনের ব্রত। আব্দুল গফুর খাঁ এই স্বেচ্ছাসেবকদের নাম দিয়েছেন খুদাই খিদমৎগার অর্থাৎ ভগবানের সেবক।

ব্যক্তিগত জীবনে আব্দুল গফুর খাঁর সাহস ও সহনশীলতা অপরিসীম। একবার কারাগারে তিনি সংবাদ পেলেন যে তাঁরই মত রাজবন্দী তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র অনশন সুরু করেছেন। গফুর খাঁ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতেরও চেষ্টা করলেন না—কিংবা তাঁকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করারও প্রয়াস পেলেন না। কার্যত তাঁর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রটি ৭৮ দিন অনশন করেছিলেন। যখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল এবং তাঁর জীবন সংশয় দেখা দিল, যদি তিনি মারা যান এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্টের কাছে গফুর খাঁ তাঁর মৃতদেহের সৎকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পত্র লিখেছিলেন। এরূপ নৈতিক সাহস এবং মানসিক বল সচরাচর দেখা যায় না।

বাগ্মিতা বলতে সাধারণত যা বোঝা যায় গফুর খাঁর তা নেই। তিনি কাজের লোক—বক্তৃতা তিনি কমই দেন। নিজের প্রদেশের বাইরে তিনি একরকম মুখ খোলেন না বললেই চলে। কিন্তু তিনি যখন কোন বক্তৃতা দেন, সে বক্তৃতা হৃদয় থেকেই দেন। তাই তাঁর শ্রোতৃবৃন্দের উপর সে বক্তৃতা প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের বোম্বাই প্রস্তাবের পর তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কারাগারে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। কংগ্রেসের অনুপ-স্থিতির সুযোগে সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস হোক, আর মুসলিম লীগ হোক সবাই আব্দুল গফুর খাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। কয়েকমাস আগে মুসলিম লীগের অন্যতম

মন্ত্রী সংবাদ পত্রের মারফৎ দেশবাসীদের জানিয়েছিলেন যে আব্দুল গফুর খাঁকে তিনি অন্য কারও চেয়ে কম শ্রদ্ধা করেন না। তাঁর অসুখ যাতে ভাল হয়, সে জন্যে সকল ব্যবস্থা করার আশ্বাসই মন্ত্রী প্রবর দিয়েছিলেন। সম্প্রতি সীমান্ত প্রদেশে রাজনীতির চাকা আবার ঘুরে গেছে। ১৯৪৫ এর মার্চ মাসে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে পরাজিত করে ডাঃ খান সাহেব সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সীমান্ত গান্ধীকে মুক্তি দিয়েছেন। মুক্তি-প্রাপ্ত আবদুল গফুর খাঁ দেশবাসীদের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন। তিনি অচিরেই আবার জন-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, এরূপ ঘোষণাও আমরা তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। এই ত্যাগব্রতী স্বদেশসেবী পাঠান বীর ভারতকে মুক্তি-যুদ্ধে জয়ী দেখে যাবেন—আমরা এই আশাই করি।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

বাংলা দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পর সুভাষচন্দ্র বসুর মত জনপ্রিয় নেতা আর কেউ হন নি। সুভাষের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দুটো জিনিস বড় হয়ে দেখা দেয়: একটা তাঁর নেতৃত্বের জন্মগত অধিকার—আর অপরটি তাঁর বিপ্লবী স্বদেশ-প্রেম। তিনি কোন দিনই গতানুগতিকতার উপাসক ছিলেন না—বরং গতানুগতিকতাকে আঘাত মেরে ভেঙে ফেলাতেই তিনি যেন আনন্দ পান। এর জন্যে জীবনে তাঁকে লাঞ্ছনা যন্ত্রণাও কম সহ্য করতে হয় নি। অথচ তাঁর পক্ষে নিজের স্বভাবকে অনুসরণ করা ছাড়াও গত্যন্তর নেই। যদি

আত্মত্যাগ এবং নির্যাতন-ভোগকে স্বদেশ সেবার মাপকাঠি বলে ধরা হয়, তবে সুভাষচন্দ্র বর্তমান ভারতের কোন নেতার চেয়েই কম নন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে শুধু কারাগারে প্রেরণ করেই ক্ষান্ত হন নি ; ভারতের বাইরেও তাঁকে একাধিকবার প্রেরণ করা হয়েছে। কারাগারে একাধিকবার তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে—যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তিনি একবারও অসম্মানজনক সর্তে মুক্তি নিতে স্বীকার করেন নি। সাধারণ লোকের মধ্যে যে জিনিসকে আমরা বলি একগুঁয়েমি--বড় লোকের চরিত্রে সেটা থাকলেই বলা হয় দৃঢ়তা। সুভাষের চরিত্রে এ জিনিসটি একটু অতিমাত্রায় আছে বলে মনে হয়। জীবনে রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র দেশবন্ধু ছাড়া আর কারও কাছে তিনি মাথা নত করেন নি—আর কারও নেতৃত্ব তিনি পুরোপুরি স্বীকার করে নেননি। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের গুণে জওহরলালজীর মত বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতাও বহু বৎসর ধরে মাথা নীচু করে আছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সুভাষ সেই গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও সাফল্যের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। শুধু দেশবন্ধুর নেতৃত্বকেই তিনি শিষ্যের মত মাথা পেতে গ্রহণ করতেন। দেশবন্ধুকে তিনি শুধু শ্রদ্ধা করতেন না—পিতার মত ভালও বাসতেন। তাই মান্দালয় জেলে—সুদূর ব্রহ্মদেশে—সুভাষ যেদিন দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন, সেদিন তিনি শিশুর মতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল চব্বিশপরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের প্রতিষ্ঠাবান সরকারী উকিল। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করে সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু যেমন প্রচুর অর্থ ও যশ অর্জন করেছেন, তাঁদের পিতারও কটকে তেমনই পসার ও নাম ডাক ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের

২৩শে জানুয়ারী কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্য ও কৈশোর তাঁর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটে। সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী দেবী আদর্শ জননী। জননীর চরিত্রের ধর্মভাব, উদারতা, সহৃদয়তা ও সারল্যের প্রভাব তাঁর উপর অপরিসীম। তিনি বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র ছিলেন। অল্প বয়েস থেকেই তাঁর চরিত্রে ধর্মভাবের প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী পাঠ এবং ধ্যান ধারণাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় যেত। তবু তাঁর ধীশক্তি এত বেশী ছিল যে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এর পর কলকাতায় এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের আই-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। তখনও সুভাষচন্দ্রের মনে ধর্মভাব প্রবল। হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে তিনি একজন বন্ধুর সঙ্গে গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেন। হিমালয়ে বহুদিন ঘুরেও তিনি মনোমত গুরু পান না। তার পর হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু মনোমত গুরুর সন্ধান মেলে না। হতাশ হয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি বাড়ী ফিরে আসেন এবং বাড়ী ফেরার কিছুকাল পরেই দুরারোগ্য টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন ভোগেন। এর পর কয়েক মাস পড়াশুনো করে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আই-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজেই দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে তিনি বি-এ পড়তে সুরু করেন। তিনি তখন কলেজের ছাত্রদের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মিঃ ওটেন নামক একজন ইংরেজ অধ্যাপকের দুর্ব্যবহারের জন্যে ছাত্রদের ধর্মঘট সুরু করেন। ধর্মঘট মিটে যাবার প্রায় এক মাস পরে মিঃ ওটেন পুনরায় ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তারা তাঁকে প্রহার করে। ছাত্রদের নেতৃত্বের অপরাধে সুভাষকে অনির্দিষ্ট

কালের জন্যে কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। বিপ্লবী কার্যে এই প্রথম সুভাষচন্দ্রের হাতে খড়ি। মিঃ ওটেনের ব্যবহারে তিনি সর্বপ্রথম শাসক শ্রেণীর ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন। কিছুকাল বাড়ীতে বসে থাকার পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার অনুমতি পেয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি-এ পাশ করেন। এর পর আত্মীয় স্বজনের বিশেষ অনুরোধে পড়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে বিলাত যান। বিলাত যাত্রার মাত্র আট মাস পরে আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এর পরও তিনি বিলাতে থাকেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পড়তে থাকেন। কিন্তু আই-সি-এস্ পাশ করা সুভাষের ধাতে সইল না। তিনি বিলাতে থাকার সময় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় বহু স্বদেশপ্রেমিক সরকারী কর্মচারী চাকুরী ত্যাগ করেন, রবীন্দ্রনাথ স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতের বুকে আর এরূপ স্বাধীনতার সাড়া কোন দিন পড়ে নি। দেশ-প্রেমিক সুভাষ বিলাতে থেকেও এ আন্দোলনে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সর্বপ্রকার উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি আই-সি-এস পাশ করার মাত্র একবছর পরে চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। সেই দিন থেকে তাঁর জীবনে একটি নতুন অধ্যায় সুরু হল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কেম্ব্রিজের বি-এ ডিগ্রী নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন।

দেশে ফিরেই তরুণ সুভাষ গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর দেশ সেবার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বাংলার অবিসম্বাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে সেই যে সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা সুরু হল, দেশবন্ধুর মৃত্যু পর্যন্ত সে সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ ছিল। দেশবন্ধু সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের ভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়। কংগ্রেসের আহ্বানে এই সময় তিনি একটা বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীও গড়ে তোলেন। এই স্থলে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। জীবিত নেতাদের মধ্যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ছাড়া সুভাষচন্দ্রের মত সংগঠনী শক্তি বোধ হয় আর কারও নেই। বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে একাধিকবার নিজের দল গড়ে তুলতে হয়েছে এবং তিনি তা সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন। এরপর ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর আইন অমান্য আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি ধরা পড়েন। প্রায় তিন মাস হাজতবাসের পর দেশবন্ধু এবং সুভাষ ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগারে তিনি এবং দেশবন্ধু একই কামরায় থাকায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জেল থেকে মুক্তি পেয়েই সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবন সাহায্য-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং বন্যার্তদের কষ্ট নিবারণের জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস পান। বন্যাত্রাণে তাঁর অপূর্ব কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটনও তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এর পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গয়া কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাউন্সিলে প্রবেশ নীতি পরিপূর্ণ সমর্থন করেন এবং স্বরাজ্যদল গঠনে তাঁকে সাহায্য করেন।

গয়া থেকে ফিরে সুভাষচন্দ্র 'বাঙলার কথা' নামে একখানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তখন দেশবন্ধু তাঁর উপর স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। সুভাষচন্দ্রের সুযোগ্য পরিচালনায় 'ফরোয়ার্ড' অল্পদিনের মধ্যে নাম-করা পত্রিকা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের নতুন নির্বাচনে দেশবন্ধু দাশের স্বরাজ্য দল কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব পান এবং দেশবন্ধু সর্বপ্রথম কংগ্রেসী মেয়র নির্বাচিত হন। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম-কর্তা নিযুক্ত হন। তিনি যে কয়েক মাস এই কাজে নিযুক্ত থাকার সময় পেয়েছিলেন, তারই মধ্যে তিনি নিজের কর্মদক্ষতা ও শক্তির অপূর্ব পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রধান কর্ম-কর্তা নিযুক্ত হবার মাত্র ছয় মাস পরে তিনি ভারত শাসনের তনং বিধি অনুসারে বিনা বিচারে বন্দী হন। কিছুদিন বাংলার কারাগারে রাখার পর তাঁকে সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। বন্দী অবস্থাতেই তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর কারামুক্তির জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়—কিন্তু কোন ফল হয় না। মান্দালয়ে কারাবাসের সময় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে সুভাষচন্দ্র শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মাসিক বসুমতী'তে 'স্মৃতিকথা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুদূর মান্দালয় জেলে প্রবন্ধটি পড়ে সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে। চিঠিটার অংশ বিশেষ উধৃত করে দিলাম: "আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার ভাল লাগল, 'একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার:

জনের জন্যে মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁর আশে পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না।' বাস্তবিক হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে, তাহলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় 'অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ।' আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে? আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে।······'আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।' প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মত-নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্য চরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভাল মন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।"

মান্দালয়ের কারাগারে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁকে গভর্ণমেণ্ট সর্তাধীনে মুক্তি দিতে চান। কিন্তু তিনি ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ তিনি বিনা সর্তে মুক্তি পান। তাঁর মুক্তি-সংবাদে সমগ্র দেশ আনন্দ-চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তাঁর রাজনৈতিক কাজের বিরাম থাকে না। দেশবন্ধুর মৃত্যুর ফলে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল—একটি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পন্থী—অপরটি সুভাষ-পন্থী। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই

দুই দলের মধ্যে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মত-বিরোধ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে আবার দেশবন্ধুর মত সুভাষের নেতৃত্বে উভয় দল সম্মিলিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাজ করেন। এই অধিবেশনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আপোষমূলক প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন: "স্বাধীনতা আমরা চাই—এ স্বাধীনতা আমাদের সুদূর ভবিষ্যতের আদর্শ নহে—স্বাধীনতা বর্তমানেই আমাদের দাবী।" ১৯২৭ থেকে থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা শ্রমিক সম্মেলনের সভাপতি হন এবং ১৯৩১ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তাঁর জীবন অত্যন্ত কর্মবহুল ছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র পুনরায় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সালেই কারাগারে থাকার সময় আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর কারামুক্তি হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় সরকারী আদেশ অমান্য করে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হবার আগেই মার্চ মাসে তাঁর কারামুক্তি হয়। কিন্তু পুনরায় এক বৎসর যেতে না যেতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করে ফেরার পথে তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে ধরা পড়েন এবং মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলে

নীত হন। পরে তাঁকে সেখান থেকে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেল, ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাস এবং বলরামপুর (যুক্তপ্রদেশ) হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তখন বহু বিবেচনার পর তাঁকে চিকিৎসার জন্যে ইউরোপ যাবার সম্মতি দেন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইউরোপ যাত্রা করেন এবং ৮ই মার্চ ভিয়েনায় পৌছেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ তিন বৎসর তিনি ইউরোপে ছিলেন। মাঝখানে একবার ১৯৩৪-এর ডিসেম্বর মাসে পিতার সাংঘাতিক অসুখ সংবাদ পেয়ে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু পিতার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয় নি—তিনি ভারতে পৌছে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পান। তিনি পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মাস খানেক কলকাতায় ছিলেন—সে সময়ে তাঁকে পুলিশের কড়া নজরে থাকতে হত। ১৯৩৫ এর ৮ই জানুয়ারী শ্রাদ্ধ কার্যাদি শেষ করে তিনি পুনরায় ইউরোপে যাত্রা করেন। ইউরোপে তাঁর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি ভারতে ফেরার অনুমতি চেয়েও পান না। তিনি জোর করে ভারতে ফেরেন এবং ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেই ১৮১৮ সালের তিন আইনে ধরা পড়েন। আবার কারাবাস এবং অন্তরীণ থাকার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিমান যোগে অষ্ট্রিয়া যান এবং ভাল ভাবে চিকিৎসা করান। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ভারতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৪শে জানুয়ারী তিনি ইউরোপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৮ এর ১১ই ফেব্রুয়ারী হরিপুরায় জাতীয় মহাসভার ৫১তম অধিবেশন হয়। ভারতের

তরুণতম নেতা সুভাষচন্দ্রকে মহাসমারোহে সুদীর্ঘ চার মাইলব্যাপী শোভাযাত্রা করে একান্নটি বলীবর্দবাহিত রথে করে কংগ্রেস নগরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশবন্ধু দাশের পরে বাংলাদেশ থেকে সুভাষই প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ দেন, সেটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। অভিভাষণে তিনি বিশ্ব রাজনীতির গোড়ার কথা বিশ্লেষণ করে দেশবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার আহ্বান জানান। ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের যে প্রয়াস পাচ্ছিলেন, কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষ তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিরূপে সুভাষচন্দ্র সমগ্র দেশের কাছে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে শান্তিনিকেতনে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।) এর পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জাঁদরেল সদস্যদের মতভেদ হয়। জাঁদরেল সদস্যরা এই বছরের জন্যে কংগ্রেসের অন্যতম প্রবীণ সদস্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে সভাপতি নির্বাচিত করতে চান। কিন্তু অনেক প্রদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল পুনরায় সুভাষকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে চায়। তাই মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে অন্যান্য দক্ষিণপন্থী সকল কংগ্রেস নেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ডাঃ পট্টভির সঙ্গে নির্বাচন দ্বন্দ্বে আবির্ভূত হন এবং ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুস্পষ্টভাবে পরাজিত করেন। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা চটে গিয়ে পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে সুভাষকে অসুবিধায় পড়তে হয়। এমনই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এর পরে কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাতে কংগ্রেস-

কর্তাদের চক্রান্তের ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর স্থলে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষের বিরোধ সুরু হল—এ বিরোধ আর মেটে নি। কিন্তু সুভাষ বসে থাকার লোক নন। রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করার পরেই তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে নিজের একটি সর্বভারতীয় দল গড়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি পত্রিকাও বের করলেন। ভারতের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি জোর প্রচার-কার্য চালাতে লাগলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ পরিচালনার জন্যে সুভাষকে তিন বৎসরের জন্যে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হল। তাঁর পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতিকেও বাতিল করে দেয়া হল। ফলে আরও বিশৃঙ্খলা সুরু হল। ১৯৪০-এ কংগ্রেসের রামগড়ে বার্ষিক অধিবেশনের সময় সুভাষ রামগড়ের অদূরে একটা বিরাট আপোষ-বিরোধী সম্মেলন করলেন। এমনই করে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ বেড়ে চল্‌ল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী দেশবাসীরা হঠাৎ জানতে পারল যে সুভাষ স্বগৃহ থেকে উধাও হয়েছেন। তিনি তখন স্বগৃহে পুলিশের নজরবন্দী ছিলেন। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। কেউ বলল তিনি হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছেন—কেউ বলল তিনি আবার কৈশোরের মত গুরুর সন্ধানে হিমালয়ে চলে গেছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ বহুদিন নীরব ছিলেন। পরে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে সুভাষচন্দ্র জার্মানী, জাপান প্রভৃতি কোন একটি অক্ষশক্তির দেশে আছেন। ইতিমধ্যে একবার খবর এল যে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় সুভাষ বাবুর মৃত্যু হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদ সুভাষের শোকগ্রস্তা বৃদ্ধা জননীর কাছে শোকজ্ঞাপক তার পাঠালেন। পরে অবশ্য এ সংবাদটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। তদবধি সুভাষের আর কোন খোঁজ খবর নেই। তাঁর অশান্ত বিপ্লবী জীবন শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে কে জানে?